প্রথম প্রকাশ
শুভ ১লা বৈশাখ ১৩৬৭ সন
প্রকাশক
শ্রীসুনীল মণ্ডল
৭৮/১ মহাত্মা গান্ধী রোড
কলকাতা-৯
প্রচ্ছদপট
শ্রীগণেশ বসু
৫৯৫ সারকুলার রোড
হাওড়া-৪
ব্লক
স্ট্যাণ্ডার্ড ফটো এনগ্রেভিং কোং
১ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
কলকাতা-৯
প্রচ্ছদ মুদ্রণ
ইম্প্রেসন্ হাউস
৬৪ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট
কলকাতা-৯
মুদ্রক
শ্রীকিঙ্করকুমার নায়ক
নায়ক প্রিণ্টার্স
৮১/১-ই রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীট
কলকাতা-৬।

পনের টাকা

স্বপ্নময়ী দেবীকে

আমাদের প্রকাশিত
লেখিকার অন্য বই

বিবেক বিদায় পালা

আশ্রয়

১

খিদিরপুর বলতে যাঁরা চমকে ওঠেন, তাঁদের আরেক ভাবে চমকে দেবার জন্যেই এখন বহুতল বাড়ির পর বাড়ি উঠছে। "ইটের পরে ইট, মাঝে মানুষ কীট, নাইকো ভালবাসা, নাইকো খেলা" এখন এ সব বাড়িতে মোটেই খাটে না।

বহুতল বাড়ি, বহু মানুষের বাস, বহু ভালবাসা, নানা রকম খেলা, সবই আছে।

এমনই একটি বাড়ি "বর্ণমালা"।

বাড়িটি বহুতল। আবার ছয়টি ব্লকে বিভক্ত। আপনি যখন ঢুকলেন। তখন যেন ছোটখাট একটি নগরীতে ঢুকলেন।

মস্ত বড় পার্ক সামনে রেখে তিন দিকে তিনটি ব্লক। পিছনে একই রকম পার্ক, একই রকম তিনটি ব্লক। প্রোমোটাররা পরিবেশদূষণ। সবুজের দরকার, এ সব জানেন, বোঝেন। তাই বর্ণমালা বাড়ির সুউচ্চ পাঁচিলের গা দিয়ে দেখবেন ইউক্যালিপটাস ও দেবদারু গাছ। পাঁচিলের গায়ে আইভিলতা। পার্কেও চমৎকার গাছের বাহার।

আর শিশুদের মন ভোলাবার জন্যে তারের বাঁধনে লতা ও মেহেদির সবুজে হাতি, ঘোড়া, কত কি যে রয়েছে। ছোটদের জন্যেও দুটি পার্কেই আলাদা ব্যবস্থা।

"বর্ণমালা" নামটি তেমন সুবিধের নয়। কিন্তু প্রোমোটারদের মধ্যেও

আরব্যোপন্যাসের রহস্য পেটিকার জাদু। যে পেটিকা খুললে আরেকটি পেটিকা। খুললে আবার একটি।

প্রোমোটারদের মধ্যেও আরব্যোপন্যাস। যাঁকে সবাই প্রধান বলে জানে, তিনি প্রধান নন। আসল লোকটি আছেন পেছনে, চুপচাপ।

কিন্তু তাঁর মনে রুচিবোধ কম নয়। নাম চাই, নতুন নাম, এ বলে তো তিনি অন্যদের অস্থির করে মেরেছিলেন। অবশেষে তাঁর সেক্রেটারি বললেন, অত চিন্তা কেন করছেন?

—করব না? বাড়ির নাম দেয়া কি সোজা কথা একটা? ভাবতে হয় না?

—বউদি বলেছেন, তিনি গুরুজীর কাছে যাবেন, গুরুজী নাম দেবেন।

—সে তো আমিও জানি। "ব" দিয়ে নাম রাখতে হবে।

আসল লোকটির বাড়ির নাম "বৈশাখী", বাগান বাড়ির নাম "বিচিত্রা", পার্ক স্ট্রীটে আপিস বাড়ির নাম "বরুণা"। গুরুজীর নাম বরাভয়ানন্দ স্বামী। তাই "ব" ছাড়া ওঁর মোক্ষ নেই।

বরাভয়ানন্দকে পাওয়া বড় মুশকিল। আজ তিনি এখানে তো কাল তিনি ইতালীতে। গ্রীষ্মে তিনি ফ্রান্সে তো শীতে তিনি গ্রীসে। কলকাতার আপিসে গেলে টেলেক্সে বার্তা আসে, ভক্তজনের এই যা সুবিধে।

"আপিস" মানে এক শিষ্যের বাড়ির এগারো তলায় কাচের দেয়াল দেয়া সুবিশাল ফ্ল্যাট। প্রতি তলে ছয়টি ফ্ল্যাট। এগারো তলায় একটি। সেখানে বাগান। ছোট সাঁতার কাটার পুল, দোলনা, সবই আছে।

বরাভয়ানন্দের সাহায্যে চীট ফাণ্ডে ডুবুডুবু মানুষটি দিল্লীর দৌলতে বিদেশের সঙ্গে আমদানি রপ্তানির কারবার করে কোনো মতে সার্কুলার রোডে এই বাড়িটুকু। দিল্লীতে বাড়ি। দার্জিলিংয়ে হোটেল। এ ভাবে ডালভাতের ব্যবস্থা করতে পেরেছেন।

তাই এগারো তলা গুরুদেবকে দিয়ে রেখেছেন। ওই এগারো তলাতেই টেলেক্সে বার্তা এল "বর্ণমালা"।

বর্ণমালা বাড়ির নামকরণ এ ভাবেই হল। আসল লোকটির বড় ইচ্ছে

ছিল যে "অ" থেকে "হ" সব বর্ণওয়ালা নামের মানুষরা আসুন, কিন্তু তা হয় নি। হলে ব্যাপারটি কাব্যিক হত। কিন্তু চার থেকে সাত লক্ষ টাকা দিয়ে যারা ফ্ল্যাট কিনবে, কাব্যের দরকার বুঝে তাদের নামকরণ হয় নি। সব কি আর হয়? যা হয়েছে তাই ভালো।

আসল প্রোমোটারের এমন ইচ্ছেও ছিল। অ-বাবুর ফ্ল্যাটের নাম যেমন অবন্তিকা, তেমনি অন্যেরাও যে যার ফ্ল্যাটের নাম রাখুন।

সবাই রাখেন নি। তবে হরনাম মালহোত্রা ফ্ল্যাটের নাম রেখেছেন "হালাংগা", তাঁর পৈতৃক গ্রামের নাম। এবং উ-বাবু ফ্ল্যাটের নাম রেখেছেন "বরিশাল মহিমা"।

কাব্যবোধ কারোরই নেই। ভাবলেও আসল প্রোমোটারের দুঃখ হয়। এক নম্বর ব্লকের সব চেয়ে ওপরে তিনিও তিনটি ফ্ল্যাট রেখেছেন। সেখানে মাঝে মাঝে তিনি রাত কাটান, তারা গোণেন এবং দেশের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তা করেন।

এ রকম বাড়িতে সকলেরই ভালো থাকবার কথা।

অথচ অঘটন ঘটে গেল।

২

ঘটল তো ঘটল 'অবন্তিকা'য়।

অবন্তিকা অ-বাবুর ফ্ল্যাট। অ-বাবুর বউয়ের নাম কুঙ্কুম। এ বাড়িতে এ-ওর সঙ্গে মাখামাখির রেয়াজ নেই। অ-বাবু আর কুঙ্কুমের আরোই নেই। কুঙ্কুম এ বাড়ির কোনো লোককেই যথেষ্ট সংস্কৃতিসম্পন্ন বলে মনে করে না। দর্শন শাস্ত্রের এম. এ. হলে কি হয়। সংস্কৃতি বলতে কি বোঝায় তা নিয়ে ও ঘণ্টার পর ঘণ্টা বক্তৃতা দিতে পারে।

অন্য লোককে কি, স্বামীকেই বলে, তোমার কালচার নেই।

কি বলবেন অ-বাবু? এ কথা সত্যি যে, কুঙ্কুমের ভাইয়ের বউ ভাস্বতীর ভাইয়ের মতো অ-বাবু রবিশঙ্করের সেতার বোঝেন না।

কুঙ্কুমের মাসতুত বোন রুমার মতো বোঝেন না রামকিঙ্করের মূর্তি, বা যামিনী রায়ের ছবি। এবং পিকাসোর ছবি আজও বোঝেন না বলে শালার বউ ভাস্বতী ওঁকে অসম্ভব অপদস্থ করে।

অ-বাবু এ সব কথাবার্তার সময়ে চুপ করে থাকেন। ঠোঁটে একটা হাসি-হাসি ভাব লাগিয়ে রাখেন অবশ্য। কালচার-ভালচার!

ভাস্বতীর ভাই, বর্ণমালার প্রতিবেশীর ছেলে জয়রাজ, রুমা, এরা সব সংস্কৃতি-শকুন। কলকাতায় বইমেলা থেকে ফোটো প্রদর্শনী, ঢোকরা প্রদর্শনী থেকে আধুনিক হিন্দী নাটক, ফুলের প্রদর্শনী থেকে নন্দনে ফিলমোৎসব, সর্বত্র এরা কি উদ্যমে ছোটাছুটি করে।

মেয়েদের সকলের এক রকম চেহারা, সাজ-পোশাক, ছেলেদেরও তাই।
অ-বাবু মনে মনে হাসেন।
দেখছ অনেক, শুনছ অনেক, বুঝছ কি ? বুঝবে, ভাববে, অত সময় কোথায় ?
এখন তো সকলেরই নাই, নাই, নাই যে বাকি সময়-টময়। অ-বাবু মনে মনে অনেক গবেষণা করে দেখেছেন, ওদের আমল না দিলেও ওঁর বেশ চলছে, চলবে।
অ-বাবু নিজেই জানেন, থার্ড থিয়েটর কি বস্তু তার জন্যে মাথার মগজ খরচ করা বাজে খরচ। থার্ড থিয়েটর না জানলেও তিনি বুদ্ধিমান।
লেখাপড়ায় কি খারাপ ছিলেন ? যথেষ্ট ভালো ছিলেন। ছাত্রজীবনের কথা ওঁর মনেও হয় না তেমন। বর্তমান নিয়ে যারা ভীষণ ব্যস্ত, তারা কেমন করে অতীতের কথা মনে করবে ? অবসর কোথায় তাদের ?
কুঙ্কুমও কখনো জানতে চায় না।
সে একজন সফল ও ধনী ঠিকাদারকে বিয়ে করেছে, বিবাহ-পূর্ব অ-বাবু বিষয়ে তার কোনো আগ্রহ নেই। অ-বাবুর মাঝে মাঝে মনে হয় এটা সময়ের ধর্ম। এখন কে চায় অতীতে ফিরতে, হিম ঢাকা জ্যোৎস্নায় বনপথ থেকে পাতা সরিয়ে পথের চিহ্ন খুঁজে বের করতে ? বনপথ ফুলে ফুলে ঢাকা—গানটা মাঝে মাঝে মনে পড়ে।
এখন যার সঙ্গে যার আলাপ হল, তখন থেকেই যেন সব কিছুর শুরু। এটা সময়ের হাওয়ায় এসে গেছে। অ-বাবু তা বোঝেন বলেই সময়ের মাপে নিজেকেও মানিয়ে নিয়েছেন।
লেখাপড়ায় ভালো ছিলেন। বিশ্লেষণী মন ছিল।
অধ্যাপকরা বলতেন, গবেষণা করো। গবেষণা করলে তুমি অনেক ওপরে উঠবে।
—না সার, আমি পারব না।
—পারবে।

—ওতে পয়সা নেই।

ওটাই হিসেবে ভুল হয়ে গিয়েছিল। গবেষক, আধুনিক গবেষকদেরও এখন রমরমা খুব। লেখাপড়া শিখে বিদেশে যাওয়া যায়। স্বদেশে কোনো বিশ্ববিদ্যালয় বা শিক্ষা-গবেষণা সংস্থায় কাজ নেয়া যায়। সেমিনারের পর সেমিনার করা যায়।

অ-বাবুর একদা বন্ধু শুভেন্দু যদিও লেখে, একদিন যাব, মুড়ি বেগুনি খাব, কাঁচা আমের টক—তবু আজও তার সময় হয় নি। উড়ে উড়ে মেলবোর্ন থেকে প্যারিস, মিনেসোটা থেকে জেনিভা, বেচারা ভূমিস্থ হবার সময় পায় না।

অ-বাবু গবেষণা করেন নি, ঠিকাদারি আপিসে ঢুকে কাজ শিখেছিলেন। সন্ধানী মন, গবেষকের মন। সে মন ঠিকাদারিতে লাগালেও যে সোনা ফলে, অ-বাবু তার প্রমাণ।

কাজ বাগান যাদের নামে, তারা আসল লোক নয়। অ-বাবু থাকেন পিছনে। এ ভাবে টেণ্ডার ধরানো এবং বিল আদায় করা এলেমের ব্যাপার।

অধ্যাপক বলতেন, অধ্যাপনা করো। করেন নি বলেই তো আজ তাঁর বেনাম আপিসে অন্তত দশটা লোক আছে, যাদেরকে কলেজের মাস্টার-দের ডবল মাইনে দেন।

কলকাতা বর্তমানে টাকার মহাসমুদ্র। মেট্রো রেল থেকে ধাপার মাঠ সমান করা, ব্রিজ তৈরি থেকে হাসপাতাল তৈরি, যাতে যাবে তাতেই টাকা।

অ-বাবুর নাম অর্জুন চক্রবর্তী। দুষ্ট লোকেরা বলে আসলে ওঁর নাম সনাতন পুষিলাল। কিন্তু নামটি যথেষ্ট সুন্দর নয় বলে উনি নাম পালটে নিয়ে একটি সুন্দর নাম রেখেছেন। নিজেই নিজের নামকরণ করেছেন।

আজ অঘটন ঘটল তাঁর ঘরেই।

বিয়ের পর দশ বছর কেটেছে। কুঙ্কুম এতদিনেও মা হয়নি। এমন নয় যে তার বা অ-বাবুর অনিচ্ছে ছিল। তবু ও মা হয় নি। মনে কি ওর কোনো দুঃখ ছিল?

তাও তো জানা যায় না।

তবে মাঝে মাঝে বলত বটে, এত টাকা দিয়ে কি করব আমরা? কাকে দেব, কি করব, কার জন্যে জমাচ্ছি টাকা?

অর্জুন বলতেন, ধৈর্য ধরো। কেষ্টকালী তো বলেছে, সন্তান তোমার হবেই।

কেষ্টকালী কবিরাজ, নামকরা কবিরাজ। খুব ভালো পসার তাঁর। অর্জুনবাবুর সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্বের ইতিহাস এঁরা দু'জন ছাড়া কেউ জানে না। একদা অর্জুনবাবুর বাবা কেষ্টকালী কবিরাজের বাবার জন্যে গাছ-গাছড়া এনে দিতেন।

গরিব, ভীরু মানুষটি একদিন শাস্ত্রীমশাইকে মিনতি করে বলেছিলেন, বাবু! আপনার দয়াতে কতজন অন্ন পাচ্ছে। আমার ভাগ্নেটাকে একটু আশ্রয় দেবেন? ছেলেটা পড়াশোনায় খুব ভালো। মা-বাপ নেই। আমি কতদূর পারব বলুন?

বৃদ্ধ কবিরাজ ছিলেন সেকেলে মানুষ। তাঁর বাড়িতে একতলায় এমন দুঃস্থ ছেলেরা কয়েকজন থেকে লেখাপড়া করত।

—বেশ তো নিয়ে এসো।

সে ভাবেই ও বাড়িতে অর্জুন বা সনাতনের প্রবেশ। কেমন করে সনাতন হল অর্জুন। আর অতীতকে মুছে ফেলে ক্রমে সমাজের বারো-তলায় উঠে গেল উচ্চাশার লিফটে চেপে, সে সব কথা এখন অতীত ইতিহাস।

বৃদ্ধ কবিরাজ তাঁর রমরমা দেখে যায় নি। কেষ্টকালী হলেন অতীতের সঙ্গে অর্জুনের একমাত্র যোগসূত্র।

কুঙ্কুম অবশ্য অতটা আস্থা রাখে না আয়ুর্বেদে। সে মন থেকে মানতে

পারে নি।

অথচ সেই অত্যাশ্চর্য ঘটনাটি ঘটে গেল। কুঙ্কুম আজ আট মাস সন্তানসম্ভাবিতা। বর্তমানে সে বাপের বাড়ি। এ সময়ে ওকে সেবাযত্ন দরকার। অর্জুন তো বাড়িতে কমই থাকেন।

মায়ের কাছে কুঙ্কুম ভালোই থাকবে। অর্জুনবাবু নিশ্চিন্ত, খুব নিশ্চিন্ত।

ছেলে হবে, না মেয়ে তা নিয়েও ওঁর চিন্তা নেই। ছেলে হলে তো কথাই নেই। তিলে তিলে গড়ে তোলা সাম্রাজ্যের ভার তাকেই দিয়ে যাবেন।

মেয়ে হলে ?

সেও সবই পাবে। যেহেতু সেই সব পাবে, যেহেতু শ্বশুরবাড়িতে রহস্য-জনক ভাবে মৃত্যু তার হবে না। মেয়েকে তিনি তৈরি করে যাবেন।

এই সবই ভাবেন উনি আজকাল। আজও তাই ভাবছিলেন। এমন সময়ে বাড়ির ঝি যমুনা ঢুকে পড়বে, এমন দুঃসংবাদ দেবে, কে ভেবে-ছিল ?

যমুনা এই বিতর্কিত অঞ্চলের বস্তিতে থাকে। ডকের কাছাকাছি এই অঞ্চল নানা কারণেই বিতর্কিত। শোনা যায় যে এ অঞ্চলের সাধারণ মানুষ মাত্রেই কোনো-না কোনো সমাজবিরোধী কাজের সঙ্গে যুক্ত। কিন্তু সে কথা ভাবলে "বর্ণমালা"র মতো বহুতল বাড়িগুলির বাসিন্দা-দের চলবে কেন ? কাজ করার লোক তো চাই।

ঝকঝকে আধুনিক ফ্ল্যাটগুলিতে আধুনিকতম ঘর গৃহস্থলীর জিনিস। টেলিভিশনে, বিজ্ঞাপনে, সিনেমায় এখন বেজায় ধনী এক সমাজের মানুষের ঘর গেরস্থালীর যেমন ছবি দেখা যায়, এ সব ফ্ল্যাটেও ঠিক তেমনি রান্নাঘর, বসার ঘর, শোবার ঘর।

এমন ঘরের ঘরণীরা ঘরের কাজ করেন না। এ সমাজ পশ্চিমের মতো হবার জন্যে বাইরের সাজগোজ নিখুঁত করে ফেলেছে।

ভেতরের মনটা বদলায় নি।

পশ্চিমে ঝি-চাকর কম জনই রাখে। স্বামী-স্ত্রী ভাগাভাগি করে সংসারের কাজ করে—এ সব কথা এ দেশের উঁচুতলা মানে না।

মনে মনে সবাই জমিদার।

ঝি চাই, চাকর চাই, রাঁধুনি চাই, স—ব চাই। ঘরের কাজ করতে সবাই নারাজ।

তাই আশপাশের বস্তি ভরসা।

কি করবে পর পর বহুতল বাড়ির বাসিন্দারা ? কাজের লোকজন যে সন্দেহজনক, তা জেনেই লোক রাখা।

ভরসা নেই মনে। তাই দরকার সিকিউরিটি সার্ভিস। দরকার দিনরাত পাহারা।

"বর্ণমালা"তেও তেমন ব্যবস্থা আছে।

সেই জন্যেই তো অর্জুনবাবু নিশ্চিন্ত, নিশ্চিন্ত। বাড়িতেই লকারের পর লকার। দামী কোম্পানির লকার। কাঁচা টাকাও বেনামী অ্যাকাউণ্টে যাবার আগে বাড়িতেই থাকে। কোনো ভয় নেই।

সিকিউরিটি সার্ভিস আছে।

কিন্তু যমুনা এ সব কি বলছে ?

—বাবু!

—কি বলছ যমুনা ?

—কথা আছে।

—আমার সঙ্গে ?

কুঙ্কুমের দেয়া নাইলন শাড়ি আর পিঠখোলা জামা পরে উদ্ধত যমুনা উদ্ধত চোখে তাকাল।

—তোমার সঙ্গে নয় তো কার সঙ্গে ?

—"তুমি" বলছ যে ?

—তুমি বলব, তুই বলব, কি করবে তুমি? বদমাস, শয়তান কোথাকার!

—ছি ছি যমুনা···

—বউদি যেতে না যেতে আমার সঙ্গে লটর-পটর করার সময়ে মনে ছিল না ?

—আস্তে যমুনা, আস্তে।

—আমার কি হয়েছে তা জানো ?

—কি হয়েছে ?

যমুনা অত্যন্ত অর্থব্যঞ্জক ভঙ্গিতে পেটে হাত রাখে ও তাকায়।

—তোমার···তোমার···

—হ্যাঁ, এটা তোমারই।

—কতদিন ?

—বউদি যবে থেকে গেছে! তাকে তো সাতমাস না হতে পাচার করলে, এবার গুণে গেঁথে হিসেব করো।

অর্জুনবাবুর মাথা ঘুরে যায়।

—যমুনা! তুমি কি বলছ ?

—যা বলছি বুঝতে পারছ না ? আমার সোয়ামি কতকাল আসে না। তুমিই যা জোর করে···নইলে কেউ কোনোদিন আমার গায়ে হাত দিতে সাহস করেনি। এখন কি ব্যবস্থা করবে, করো।

—আমি···আমি ব্যবস্থা করব ?

—নইলে কে করবে ?

—আমি কেন করব ?

—ভাবছ কাটিয়ে দেবে ? যমুনাকে চেনো না। যেথায় থাকি, গ্যাং আছে। হাটে হাঁড়ি ভেঙে দিলে তোমার অবস্থা কি হবে ভেবে দেখেছ? বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ গজালে যা হয়। বুড়ো বয়সে বউয়ের পেটে ছেলে এল, কিন্তু ঝিদের নষ্ট না করলে মন ওঠে না।

অর্জুন "বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ" শুনে চমৎকৃত হলেন। যমুনা কি মাইকেল মধুসূদনের নাটক পড়েছে ?

—কি ভাবছ বাবু ?

—দেখ যমুনা, যা হবার তা হয়েছে…

—আমাকে টাকা দিতে হবে।

—যমুনা, তুমি মাইকেল পড়েছ ?

—ইয়ারকি হচ্ছে ?

—টাকা…কেন ! আমি তোমায় নিয়ে যাব, মানে তুমিই যাবে, ব্যবস্থা করে দেব।

—না বাবু। যমুনা অত বোকা নয়।

—কেন যমুনা ?

—হাসপাতালের নাম করে কোথায় নিয়ে যাবে, খুন করবে, আমি সব জানি। বাবুদের চেনা আছে।

—ছি ছি যমুনা। আমাকে তুমি…

অর্জুনবাবু অত্যন্ত আঘাত পান। সব কিছুর জন্যে দায়ী কুঙ্কুম। ভালো শাড়ি, ভালো জামা পরে উদ্ধত শরীর নিয়ে যমুনা কাজ করত, তাই দেখে দেখেই তো…

—তোমাকে চিনতে আমার বাকি আছে ?

—শোনো, আমি তোমাকে ওষুধ এনে দেব।

—ওষুধে কাজ হবে ?

—নিশ্চয় হবে।

—সে নয় দিও। এখন টাকা ফেল।

—আবার টাকা কেন ?

—ওষুধে কাজ না হলে নার্স দিদির কাছে যাব, সে টাকা নেবে না ?

—কত টাকা ?

—এখন তো হাজার টাকা দাও।

—অত টাকা কি হাতে থাকে ?

—অ মড়াখেগো ! কাকে কি বোঝাচ্ছ ? বাথরুমের ওপরে লফটে দেয়ালে

গাঁথা লকার নেই ? কত দিন টাকা তো ওই বড় ব্যাগটা করে ওখানেই রাখো, লকারেও তোল না।

—তুমি···তুমি দেখেছ ?

—অনেক বার।

—দাঁড়াও।

গুনে গুনে টাকা নেয় যমুনা। তারপর বলে, যদি মনে করো "চোর" বদনাম দেবে, তাহলে জেনো তোমার বউ বিধবা হবে। আমার ভাই-দের তো চেনো না। দু' ভাই দুই মস্তান। তোমাকে নিকেস তারা করবেই করবে।

—না···বদনাম দেব না।

—খালাস হয়ে এখানেই ক'দিন জিরোব, ভালোমন্দ খাব, বউদি তো এখন আসছে না।

অর্জুনবাবুকে হতবাক করে রেখে হেলে দুলে যমুনা বেরিয়ে যায়।

অর্জুনবাবু মাথায় হাত রেখে বসে থাকেন। সর্বনাশ, সর্বনাশ! "বর্ণ-মালা"য় বিপর্যয়। এখন নাকি সুসময় যাচ্ছে তাঁর, আগামী আট বছর ভালো যাবে, যমুনা কি বলে গেল ?

ভাবতে চেষ্টা করেন তিনি। যমুনার বর্বর শরীর আর উদ্ধত যৌবন যেমন সত্যি, তেমনি এও তো সত্যি যে কুঙ্কুম এতদিন মা হয় নি ? কবিরাজের ওষুধ খেয়েই কি তাঁর পৌরুষ বেড়ে গেল ? সে জন্যেই কি এমন হল ?

মনের ভেতর নিজেই নিজের সঙ্গে বিতর্ক করেন। ভয় করছে, ভীষণ ভয়।

—ভয়ের কি আছে অর্জুন ?

—যমুনা যদি সবাইকে বলে দেয় —

—বলে দিলে কি হবে ?

—সমাজে আমার ইমেজ নেই একটা ?

—রাখো রাখো। তোমার সমাজে একটা ঝি নষ্ট হল না মায়ের ভোগে গেল, তাতে ইমেজ নষ্ট হয় না, তোমার সমাজ তোমারই থাকবে।

—কুঙ্কুম যদি জানে ?

—কিছু হবে না। অমন অনেক কুঙ্কুম সব জেনেশুনে অনেক অর্জুনের ঘর করছে। মেয়েছেলে টাকার বশ, জানো না ?

—যমুনা যে টাকার হদিশ জেনে গেছে।

—যাক না। তুমিও তো সিকিউরিটি সার্ভিসকে টাকা দিচ্ছ।

—ওর ভাইদের কথা যা বলল···

—থানাকে টাকা খাওয়াবে, ভাইদের ঠাণ্ডা করে দেবে থানা।

—ভয় করছে।

—ভয় পেও না।

"ভয় পেও না" বলে নিজেই চেঁচিয়ে ওঠেন অর্জুন। তারপরই মনে হয় কেষ্টকালীর কথা।

হাজার টাকা কোনো টাকা নয়। এমন অনেক হাজার টাকা অর্জুন-বাবু ঘুষ দেন, কাজ বাগান। কিন্তু একটা ঝি হাজার টাকা নিয়ে গেল, এটা যেন বরদাস্ত হয় না।

যমুনা সত্যি বলল, না মিথ্যে ? যদি ও ব্যবস্থা না করে ? যদি ওঁকে বিপদে ফেলে ? না, কেষ্টকালীর কাছেই যাবেন। ওকে বলবেন সব।

৩

যমুনার মনেও চিন্তার অবধি থাকে না। যেটা অন্যের কাছে অবিশ্বাস্য, সেটা হল ওর নিরুদ্দেশ স্বামী মলয়ের প্রতি ওর গভীর অনুরাগ।
সব সময়ে মনে হয়, মলয় ফিরে আসবে। এখন যদি ফিরে আসে। যমুনা ওকে কেমন করে বোঝাবে যে এই একবারই দোষ করে ফেলেছি, আমি তোমার কথা ভাবতে ভাবতে সব ভুলে বসে থাকতাম, বাবু যখন …শরীরেরও তো ধর্ম আছে একটা…একবার কি পা ফসকায় না?
এই বস্তির মেয়ে হয়ে যমুনার এমন ভালবাসা একটু অবাস্তব।
কেন না জনি আর তালা তো সত্যি সত্যি ওর ভাই নয়। ওরা কেউ কারো ভাই নয়। কেউ কারো বোন নয়। তবু একটা আশ্চর্য বন্ধন ওদের মধ্যে আছে।
জনি আর তালা নিশ্চয় সমাজবিরোধী। চুরি ছিনতাই করেই ওরা দিন চালায়।
যমুনাও তো ওদের কাজের একজন হয়েই ছিল। যমুনা "বর্ণমালা"য় ঢোকার পর তিনটে বাড়িতে ওরা চুরি করেছে। যেহেতু যমুনা খোঁজ দিয়েছিল, সেহেতু ওরা যমুনাকেও টাকার ভাগ দেয়।
এ কথাই তো মলয় বলত। ছেড়ে দাও এ জীবন, চলো আমরা খেটে খাব। সে অনেক ভালো। ভালো, নিশ্চয় ভালো মলয়। কিন্তু তুমি ছিলে কারখানার ব্লো ম্যান, কারখানা বন্ধ হবার পর কোন্ কাজটা

তুমি পেলে ? কাজ তো পাও নি। কাজ খুঁজে আমাকে নিয়ে যাবে বলে বেরিয়ে গেলে ঘর ছেড়ে।

জনি আর তালা বেশ আছে।

ওরা কিছু বেশি টাকা খুঁজছে। খুঁজছে পুঁজি। পুঁজি পেলেই নাকি দুজনে চলে যাবে অন্য কোথাও, অন্য শহরে। দুজনেরই অন্য একটা ভদ্র সভ্য পরিচয় আছে। একজন প্লাম্বার, একজন ইলেকট্রিক মিস্ত্রি। "বর্ণমালা"র আপিসে, অর্থাৎ তত্ত্বাবধায়ক আপিসে ওদের চেনাজানা ভালোই।

সে কারণেই এ বাড়িতেও ওরা কাজ করে মাঝে মাঝে।

যমুনা ওদের কথা ভাবতে ভাবতেই বাড়ি ফেরে।

আজ অনেকদিন হল ওরা বলছে। বাবু কোথায় কি রাখে শুধু খবরটা এনে দিবি। তুই খবর আনলি, আমরা কাজ করলাম। টাকা ভাগ হয়ে গেল। তারপর তুই আর মলয় রাজারাণী হয়ে বসে থাক্ না কেন? তোরও ইচ্ছে, হোটেল খুলবি। আমরাও চাই যে অন্য কোথাও যেয়ে কারবার করব। খবরটা আন্।

—খুব বললি। ধরা পড়িস যদি ?

—দূর, টাকা নিয়ে কোথায় পালাব কে জানছে ? আপিসের বাবু, দারোয়ান, লিফটম্যান, সবাই চেনাজানা, সবাই ভাগ নেবে। ধরাবে কে ?

অর্জুনরা অসহায়, অসহায়, অথচ তাঁরা তা জানেন না। যে কেয়ার-টেকার আপিসের ওপর নির্ভর, সেখানেও বেনোজল। জানেন না বলে মনে করেন সব ঠিক আছে।

যমুনা খুঁতখুঁত করে। আমার বিপদ হতে পারে তো ?

—আমরা থাকতে তোর বিপদ হবে ?

—হবে না, বলছিস ?

—আরে ও বাড়ির আপিসের সঙ্গে আমাদের চেনাজানা নেই ? তোকে ধরলে আমরা যেয়ে কি করি তাই দেখিস। ধরাবে কে। ওই বাবু ?

অর্জুনবাবু ? কি আমার অর্জুন রে ! দেখতে ঢ্যাপসা, টোকা দিলে পড়ে যাবে। একটা কথা, বাবু কুকুর রাখে না ?

—না। বউদি কুকুর দেখতে পারে না।

আজ ঘরে ফিরে, টাকাটি লুকিয়ে রেখে তবে যমুনা জনি আর তালাকে ডাকল।

—শোন্, কথা আছে।

যমুনা মাটির দিকে চোখ রেখে আস্তে আস্তে বলে। চোখ দিয়ে ওর জল গড়ায়। জনি আর তালা খুবই অবাক হয়।

জনি বলে, কাঁদছিস কেন ? অনাথাশ্রম থেকে পালিয়েছিলিস, টাউটের হাত কামড়ে পালালি। কোনোদিন দেখিনি যে কান্নাকাটি করছিস। এতদিনে কান্নাকাটি করছিস, এ নিশ্চয় মলয়ের কথা ভেবে।

—সে জানলে পরে···

তালা ক্রুদ্ধ গলায় বলে, জানলে কি করবে। মাথা কেটে নেবে ? বিয়ে করা বউকে ফেলে রেখে তুমি যদি সমানে বাইরে ঘোরো ··

জনি বলে, তোমার বউকে পোটেকশান দেবে কে ? সে কথা তো তুমি ভাবছ না।

যমুনা হেসে বলে, কেন, তোদেরকে ভার দিয়ে যায় নি ? বলে নি যে ওকে দেখো।

—বলেছে, আমরাও দেখছি। তবে যমুনা, তোরও বড় বাড় বেড়েছে। এই কাপড়, এই জামা !

—বাবুদের ঘরে সুতির কাপড় পরে কাজ করলে ওনাদের অপমান লাগে।

—এখন ব্যবস্থা কি ?

—খোঁড়া ডাক্তার থাকতে ভাবনা ?

এলাকা যেমন, ডাক্তারও তেমন। খোঁড়া ডাক্তার পাশকরা ডাক্তার কি না, যোগ্যতা তার কতটা, কেউ তা নিয়ে ভাবে না। এ অঞ্চলে

ওকে বসিয়েছিল একদিন পিটার সাধু।

পিটার ওর নাম নয়, সাধু ওর পদবী নয়। গেরুয়া জামা প্যান্ট পরত, এলাকার দখল নিয়েছিল। জয়বাংলার সময় সেটা। পিটার সে সময়ের মস্তান।

বস্তি-রাস্তা সংস্কার, জল ও বিদ্যুতের উন্নতি. ভোটভিখারি বাবুরা বলত, পিটার ঘরে বসে হাসত। হবে না, কিছু হবে না। তোমরাও চাও এলাকাটি পাপে ডুবে থাকুক। বস্তিবাসীরা বস্তিতেই পচে মরুক। নইলে তারা "যে যা বলবে" তাই করতে বাধ্য থাকবে কেন?

রাস্তা সারাবে না তোমরা। পুলিশ ভ্যান আর জীপ ঝপ করে ঢুকে যাক, সমাজবিরোধীদের ধরুক, তা তো তোমরাও চাও না। পিটার সাধুদের পেছনে যে তোমরাও আছ।

জল? বিদ্যুৎ? এর চেয়ে হাসির কথা কি হতে পারে? গরিব এলাকাকে জলের কল, বা বিদ্যুতের পোস্ট ও কানেকশান তোমরা আগেও দাও নি, পরেও দেবে না। চোরাই বিদ্যুৎ নিয়েই এলাকাটি চলবে, সবাই জানে।

তবে হ্যাঁ, ডাক্তার একটা দরকার। ঝকঝকে চালাক চতুর সদ্য পাশ করা ডাক্তার কে চায়? তেমন ডাক্তার চাই, যাকে দিয়ে কাজ হবে।

—এলাকা যেমন, কাজ তেমন!

খোঁড়া ডাক্তারকে ওই আনে এবং বসায়। এমনি এক ডাক্তারেরই দরকার ছিল এ পাড়ায়। গুলি বের করা, ছোরাছুরির জখম সারানো, গর্ভনিরোধক ওষুধ দেয়া, গর্ভপাতের ওষুধ দেয়া, আরো কত কি! জ্বর-জাড়ি, ঘা, ছেলেপিলের পেটের রোগ, এ সব তো আছেই।

মোক্ষম ওষুধও রাখতে হয়। মদের সঙ্গে মিশিয়া দিলে যে ওষুধ চিরতরে ঘুম পাড়িয়ে দেবে।

রাজার কাছে টাকা খেয়ে পিটার সাধুকে তেমন ওষুধ খোঁড়া ডাক্তারই দিয়েছিল।

না, খোঁড়া ডাক্তার থাকতে যমুনার ভাবনা নেই।

—বাবু যে ওষুধ দিতে চাচ্ছে?

—আরে বোকা! খোঁড়া ডাক্তারের ওষুধ খেলে তোর কাজ হবে। একবার তো হয়েছিল।

—সেটাই তো পাপ করেছিলাম রে! মলয় কত বারণ করল। বলল, বিয়ে হয়েছে আমাদের, কেন ও কাজ করতে যাবে? আমি তো শুনলাম না, তাই না?

—সে সময়ে ওর চাকরি গেল যে!

—সেই জন্যেই তো, আমরা জানি।

—লাভ হল খুব! মনোকষ্টে রেগে-মেগে ও বেরিয়ে গেল। যদি ওর কথা শুনতাম!

—যা হয়ে গেছে, তা ভুলে যাও।

—দেখ্, ওষুধ খেয়ে আমি ওখেনেই যাব। বাথরু মদিয়ে ঢুকি, চাবিও আছে। ঘরের সঙ্গে বাথরুম। বাবুও থাকে না সবসময় বাড়ি তো ফাঁকা।

—যদি তোকে মেরে দেয়?

—তখন যেয়ে চেপে ধরবি।

—টাকার হদিশটা বল্।

—বাথরুমের লপটে রাখে।

—রাখে, মানে রেখেই দেয়?

—দু'চারদিন বাদে সরায়। তবে লপটেও লকার আছে। সেখানেও···

—আমরা জানব কি করে?

—আমি ঠিক জানাব।

—জানাবি তো?

—জানাব। আর যদি দেখিস যে আমি ঘরেই ফিরি নি, তখন জানবি যে বাবু ধরে ফেলেছে। তখন যেয়ে যা পারবি, করবি।

—আমাদের কথা জানে?

—বলেছি, তোরা আমার ভাই।

—সব চে ভালো কি জানিস? খোঁড়া ডাক্তারের ওষুধ খেলি, ওখানেই শুয়ে থাকলি! আমরা যেয়ে বাবুকে শাসিয়ে টাকাও নিলাম, তোকেও নিয়ে চলে এলাম। তারপর আর কি!

—তাই করিস।

—বাবু চেম্বার রাখে না তো?

—না না, ও সবে ডরায়।

—বাড়িতে অত টাকা রাখে?

—ওখানে রাখে না কে?

—সিকিউরিটি সার্ভিস আছে না?

—তারা পাহারা দেয়।

—তবে?

—জ্বালাস নে জনি। গার্ড থাকে সদরে। ফ্ল্যাটের সদরে চৌকি মারে। তোমরা তো ঢুকছ জমাদারের সিঁড়ি দিয়ে। সে আমি খুলে রাখব।

—কাজ সেরেই পালাব।

—আমি বাপু পুরী যাব। সেথায় যেয়ে ভাতের হোটেল খুললে দুজনের চলে যাবে।

—মলয় আর তুই!

—তোরা দুজনে আছিস ভালো।

—থাকব না কেন? আমরা হলাম টেম্পোরারি। এ লাইফে টেম্পোরারি। বিয়ে সাদী হল পার্মেন্টদের জন্যে। পার্মেন্ট কে হতে চায়? মেয়েছেলের কি অভাব আছে এ সংসারে?

—তাও বটে।

—মলয় ফিরবে কবে?

—সেই জানে।

—যমুনা! আরো ঘরেও তো কাজ করিস, সেথা সুবিধে হয় না?

—লালচ বাড়াস না তালা। চার ঘরে কাজ করি বটে, কিন্তু চার ঘরে চুরি তো আমার হাতকড়ি।

পুলিশ ধরলে তোদেরও ধরবে।

—তা বটে।

—সুবিধে এ বাড়িতেই। এ বাড়িতে সবাই ঠিকে কাজ করে চলে যায়। ঘরে ঘরে তো দিনরাতের লোক! এখানেই সুবিধে, গিন্নিও নেই।

—ঠিক আছে। যো বোলেগা সো হোয়েগা। তবে তোর জন্যেও বাবুর কাছ থেকে টাকা···

—পারলে তোরা আদায় করিস।

—শোন্ যমুনা। তোর···মানে···বেশিদিনের ব্যাপার তো নয়? তাহলে বল্, হাসপাতালে নে' যাই।

—না না, সবে···

—বাড়ির নাম রেখেছে বন্নমালা!

—বন্নমালা নয়, বর্ণমালা। অ-য়ে অজগর আসছে তেড়ে। বাড়ি নয় তো ইন্দ্রপুরী। বাথরুমে বাথরুমে ঠাণ্ডা জল, গরম জল, সতেরো রকম সাবান, শ্যাম্পু, চুলের কলপ, তোয়ালের পাঁজা!

—ওখানে তো আরও অনেক কাজ করছে।

যমুনা হেসে গড়িয়ে পড়ে। যমুনা হাসতে পারে খুব, হাসলে ওকে কেমন ছেলেমানুষ দেখায়। হাসতে হাসতে বলে, ফল্‌সো নাম নিয়ে নেপাল, ময়সিন, আবেদ, সবিতা, সবাই কাজ করছে।

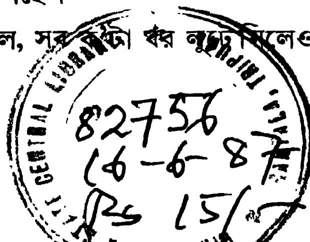
—খিদিরপুরের এমন জায়গায় বাড়ি হাঁকালে খাটতে যাবে কি সাধু-সপ্রেমী?

—তাই বল্?

—পুলিশ দেখেও দেখে না।

—সব তো বন্দোবস্তে চলছে।

যমুনা নিশ্বাস ফেলে বলে, সব কটা ঘর লুটে নিলেও পাপ সেই। সাত



নম্বরে, ড্রাইভার লাখ টাকা নিয়ে পালাল। পুলিশকে খবর দিল আপিস। ঘর মুছছি আর শুনছি, বাবু পুলিশকে বলছে, জানে দো, জানে দো। পুলিশও তেমনি খিঁচে নিল। শুধু কি টাকা? আরো কত কি চলে।

—ওদের বেলা সাত খুন মাপ।

—যাক গে, যা বলবার তা বললাম। আর যা করো, খুনখারাপি কোর না।

—তাই করি কখনো?

—জনির ঘুষি বাপু সর্বনেশে।

—না না, কারাটে তো চালাই না।

—খুনে আমার বড্ড ভয়।

—নাঃ! তুই বদলে যাচ্ছিস যমুনা। সেই সিনেমাটার মতো কেমন গেরস্ত হয়ে যাচ্ছিস। খুন কি কম দেখলি দশ বছরে?

—দেখেছি, তবে ভয় পাই।

—না না, পরিষ্কার কাজ করব, টাকা নেব, পালাব। দূরে কোথাও যেয়ে দোকান দেব।

—আমিও চলে যাব।

—মলয়কে ছাড়লে তুইও আমাদের সঙ্গে যেতে পারতিস।

—ওকে আমি ছাড়তে পারব না। তা জানে বলেই তো বলে, কাজ করি চলো, খেটে খাই।

—মলয় এলে তোর সঙ্গে ওকে পাঠাবই।

—দেখ্! কারখানার কাজও গেল, আমিও পাপ কাজটা করলাম। ও তো চলে গেল। চলে গেলেও ঘুরে ঘুরে আসে। কতবার বলে, কুসঙ্গ ছেড়ে দে যমুনা। হঠাৎ ধনী হবার সপন দেখিস না। তা আমি বলি, কুসঙ্গ মানে তো জনি আর তালা? ওরা কতদিন আমায় দেখেরেখেছে, বাঁচিয়েছে অন্যের হাত থেকে। ওদেরকে ভাই করেছি। ওরা আমার বিয়ে দিল!

—তোমার কেউ নেই, বিয়ে দেয়াটা আমাদের কর্তব্য। তুমি মোহব্বত করে বসলে!

—সেটা তো ও বোঝে না।

—ও যে অন্যরকম ছেলে। কেমন করে তোর সঙ্গেই…শুঁকে দেখেছি, ভদ্রলোকের গন্ধ আছে। আর তুইও হয়ে যাচ্ছিস গেরস্ত বউ!

—যা বলিস!

—হয় না রে যমুনা! আমরা ভদ্দর হতে পারি না। ভদ্দর হতে গেলে সর্বনাশ হয়।

—যাক গে। খোঁড়ার কাছে যে যাব, রাতদিন গাঁজা না ট্যাবলেট খেয়ে ভুলভাল করবে না তো? আজকাল কিন্তু ভুল করে।

—ভুল করবে কেন? সেদিনই তো ময়না…

—না, মনে হয় ঠিকই হবে। সকালে ভারি সুন্দর একটা পাখি দেখলাম। মন বলছে ও আজ না হোক কাল আসবে। আসুক। তার-পর বলব, চলো চলে যাই। পুরী যেয়ে ভাতের হোটেল দিই। সেও তো সৎ পথে থাকা, সৎ পথে খাটা।

—হোটেলে তুই কি করবি?

—ম্যাকসি পরে টেবিলে বসে হিসেব রাখব? লিখতে অত জানি? হোটেলে কত রকম কাজ থাকে। কিছুকাল ছিলাম তো ভাতের হোটেলে।

—মনে আছে।

—নে, সব কথাই তো হ'ল। এবারে আমি একটু বেরোব, ওষুধ নেব।

জনি ও তালা বেরিয়ে যায়। যমুনা আগে টাকা সামলায়। ভাই বলুক আর যা বলুক, টাকার ভাগ ওরা নিতই নিত।

খোঁড়া ডাক্তারের ওষুধ খেলে ছটফট করতে হয়। শরীরে বড় যন্ত্রণা হয়। সেই জন্যেই তো যমুনা অর্জুন বাবুর বাড়িতেই যাবে। যে বাথরুম দিয়ে ঢোকে, সে বাথরুমটা গেস্ট রুমের। সে ঘরেই শুয়ে থাকবে ও।

ও বাড়িতে ঠিকে কাজ করে মোহিনী, বাহাদুর। সবাই যমুনার চেনা জানা। বাবু বেরিয়ে গেলে মাছ, মাংস, মাখন, রুটি ওরা সবাই খায়। মোহিনী সরায় তেল, ঘি. চাল, ডাল, চিনি।

বাহাদুর মদের বোতল সরিয়ে বেচে দেয়।

যমুনা ও সবে নেই। ও বাথরুমে ঢুকে সাবান মেখে, শ্যাম্পু করে স্নান করে মনের সুখে। গায়ে ঢালে সুগন্ধি।

বউদির মতো সুখে ভোগে থাকলে যমুনা আজ কত সুন্দরী হত!

যাক গে, "বর্ণমালা"র কথা ভেবে কাজ নেই। মলয় আসুক, যমুনা চলে যাবে যেখানে হোক। যমুনার কপাল কেমন দেখ! চিরকাল গেল এক ভাবে। হঠাৎ মলয়কে দেখে কি যে হল!

মন বলছে সব ঠিক হয়ে যাবে।

৪

অর্জুন বাবু অবশ্য তার আগেই ছুটে গেছেন কেষ্টকালী কবিরাজের কাছে। অনেকদিনের অভ্যাস। বিপদে আপদে ওর কাছে যাওয়া। অনেক দিনের অভ্যাস।

যখন তুজনে পাশাপাশি বসে ভাত খেয়ে স্কুলে যেতেন, যখন এক সঙ্গে কলেজে ভর্তি হন, কেষ্টকালী জানতেন যে তাঁকে তাঁর বাবার আসনেই বসতে হবে।

আর অর্জুন জানতেন তাঁকে ওপরে উঠতে হবে।

সন্তান না হবার কারণে অর্জুন যখন মনে মনে খুব চিন্তিত, কেষ্টকালীই তাঁর চিকিৎসা করেন। সে চিকিৎসার ফলেই যে তিনি পিতা হতে চলেছেন, তাতে তাঁর কোনো সন্দেহ নেই।

কবিরাজের কাছে যেতে যেতে অর্জুন ভাবছিলেন, এতটা ভয় পাওয়া কি তাঁর পক্ষে ঠিক হচ্ছে?

খবরটা শুনে কেষ্টকালী কবিরাজ চোখ নামিয়ে কি যেন লিখতে থাকলেন কিছুক্ষণ। ভুরু কুঁচকে যাচ্ছে ওঁর, কি যেন ভাবছেন। তারপর কথা যখন বললেন, অর্জুন বাবুর সন্দেহ হল, এ কি তাঁর বন্ধুর গলা, না কোনো জেরাকারী উকিলের গলা?

—এ নিয়ে বর্ণমালায় ক'জন হল?

—কি নিয়ে?

—খুলে বলতে হবে ? বাড়িটা হয়েছে সাত বছর। তার মধ্যে চারটে ঝি রহস্যজনক ভাবে মরল। সকলেই ছিল সন্তানসম্ভাবিতা।

—মরার কথা বলছ কেন ?

—যতগুলো লম্পট কি ওই একটা বাড়িতে গিয়ে জুটেছে ?

—আমাকে "লম্পট" বলছ ?

—লাম্পট্য করবে। লম্পট বলব না? বাড়ির ঝি·· ছিছি অর্জুন তোমাকে আমি বাড়ির ভেতর নিয়ে যাই। সবার সঙ্গে তোমার সম্পর্ক···আমার সেকেলে শিক্ষায়, রুচিবোধে বাধছে ভাই।

—যা বলবে বলো। তবে "তোমার বাড়ি" বললে, মনে বড় লাগল ভাই। স্বপ্নেও ভাবিনি এমন কথা শুনব।

—না, তুমি বড্ড বদলে গেছ।

—এ বাড়ির ইটকাঠের কাছেও আমি ঋণী। তা আমি কখনো ভুলি না।

—ও সব প্রসঙ্গ বাবার মৃত্যুর সঙ্গেই শেষ হয়ে গেছে অর্জুন। বাবা তোমাকে আশ্রয় দিয়েছিলেন, আমি দিইনি। কলেজে ঢুকেই তুমি মেসে চলে যাও। তাই ও সব ঋণ-টিনের কথা বোল না।

—কাজটা অন্যায় হয়ে গেছে।

—অজাচার বলে একে, অজাচার।

—তোমার ওষুধও এ জন্যে দায়ী।

—ওষুধ দিচ্ছি কতজনকে, কেউ তো বাপু এমন কাণ্ড বাধিয়ে বসে নি।

অর্জুন বাবু বলতে পারেন না, যমুনাকে দেখে দেখে ওঁর মনে কি প্রচণ্ড লোভ জেগেছিল।

—কাজ করতে আসে, পেটের জ্বালায় আসে। সেখানেও তোমরা···

—যা বলবে বলো।

—অন্যেরা যা করেছে তুমিও তাই করো। মেরে ফেলো মেয়েটাকে, থানাকে ঘুষ দাও।

—অমন করে বোল না।

—এতকাল বাদে বাপ হতে চলেছ···কত আনন্দের কথা! কত করে বললাম, গভীর সংযমে থেকো। জীবনে যা যা ভাবো নি তাই তাই পেয়েছ। নিঃসন্তান ছিলে, সে দুঃখও ঘুচল, সংযমে থেকো।

সংযমেই ছিলেন অর্জুনবাবু। অন্তত কুঙ্কুম যাবার পর দেড় দিন গভীর সংযমে ছিলেন। তারপর যমুনাকে একলা পেয়ে···

—কি উপায়, বলো?

—আমার কাছে কেন এসেছ?

—কোনো ওষুধ কি দিতে পারো না?

—আমি! ওষুধ দিয়ে গর্ভপাত করায়? টাকার গরমে তুমি যে দেখছি···

—তা বলি নি ভাই!

—কোনোদিন দেখেছ ওসব ওষুধ দিতে?

—মাপ চাইছি ভাই!

উত্তেজিত কেষ্টকালী ঘরে এক পাক ঘুরে আসেন। টেবিলে রাখা জল খান এক গেলাস। তারপর কপালের ঘাম মুছে চেয়ারে বসেন।

—শোনো অর্জুন! ওষুধ দিয়ে এ ক্ষেত্রে কাজ হয় বলে আমার জানা নেই।···কি যে করি! মেয়েটা কি খুব ভয় পেয়েছে?

—আমাকে শাসাচ্ছে খুব।

—বেশ করছে।

—বস্তির মেয়ে···মস্তানরা ভাই···

—বস্তির মেয়ে যাবে না তো কে যাবে ঝি খাটতে? আর ওসব জায়গা মস্তানের জায়গা তা কে না জানে?

তোমাকে কতবার বললাম, আমার ভায়রাভাইয়ের খবর, খবর পাকা, ভবানীপুরে দোতলা বাড়ি কিনে ফেল। মোটে বিশ বছরের বাড়ি। চার তলার ভিত, একতলায় ভাড়াটে, তা দোতলা ফাঁকা! তোমার পছন্দ হল না।

—কুঙ্কুম যে রাজী হল না।

—তা হবে কেন? ভবানীপুর—কালীঘাট—চেতলা, এসব জায়গায় কি মানুষ থাকে? হঠাৎ টাকা হলে যা হয়। সোসাইটি তৈরি হয় একটা, আর সে সমাজে থাকার জন্যে ওই সব হালফ্যাশানা বাড়ি দরকার হয়। ও সব বাড়ি তো বাজারের মতো। ওখানে এসব কেচ্ছা হতেই হবে।

—সেটা ঠিক নয় ভাই। সর্বত্র হচ্ছে।

কেষ্টকালী খুব চিবিয়ে চিবিয়ে বলেন, হ.ত পারে অর্জুন! রাজবাড়িতে হোক বা বস্তিতে হোক, মেয়েছেলের ওপর অত্যাচার অন্যায়।

—মানছি, দোষ মানছি। এখন উপায় বলো।

—বিপদে পড়লে কেষ্টকালী!

কথাটা চাবুক মারে অর্জুনকে। হ্যাঁ, তাঁর দরকারে কেষ্টকালার সাহায্য চিরকাল পেয়েছেন, চিরকাল। কিন্তু তিনি কি প্রতিদানে সমান ব্যবহার করেছেন? কেষ্টকালী একটি দুঃস্থ ছেলেকে পাঠিয়েছিল চিঠি দিয়ে, তাকে তো কাজ দেন নি আপিসে।

—কি ভাবছ?

—অন্যায় আমি আরো করেছি। সেই ছেলেটিকে পাঠালে, ভাই! এত-জনকে খুশি রাখতে হয়…

—যে আমার কথা না রাখলেও চলে।

—সে ছেলেটি কি করছে?

—সবাই তো তুমি নয়। তাকে একটা ব্যাঙ্কে পিওনের কাজ করে দিয়েছে একজন।

—মুখ নেই আমার। তবু…

—তবু! বেশ, এবার জবাব দাও।

—প্রশ্ন করো।

—মেয়েটি বিবাহিতা?

—হ্যাঁ, বিয়ে হয়েছে।

—আরো সন্তান আছে ?

—না। বছর দেড়েক বিয়ে হয়েছে।

—স্বামীর কাছে থাকে ?

—স্বামীর কারখানা বন্ধ। সে কাজের খোঁজে বাইরে থাকে, মাঝে মাঝে আসে।

—এ ব্যাপারটা তোমারই ?

—স্বামী···তিন মাস আসে না···তা ছাড়া, কুঙ্কুম যখন ওবাড়ি গেল তার পর থেকেই···

—মেয়েটা কি রকম ?

—এমনিতে জাঁহাবাজ, তবে খারাপ মেয়ে নয়। স্বামীর কাজের জন্যে অনেক বলে···

—বুঝলাম।

—কি করব বলো ?

—ওকে নিয়ে এসো।

—কেন ?

—হাসপাতালে আখছার হচ্ছে, আইনগত বাধাও নেই, কিন্তু তোমার নাম জড়িত, চেনাজানা নার্সিংহোমে পাঠিয়ে দেব, অপারেশন করবে।

—নার্সিংহোম ?

কেষ্টকালী অত্যন্ত সুপুরুষ, ব্যক্তিত্বপূর্ণ চেহারা। ঠোঁট পাতলা এবং এখন সে ঠোঁট বেঁকে গেল ধারালো হাসিতে।

—ভাবছ কি ? আমার বেনাম নার্সিংহোম ? না তোমার রোগী পাঠিয়ে আমি কমিশন নেব ?

—না না, তা নয়।

—শোনো, বোঝো ব্যাপারটা। এ সব জিনিস বড় দায়িত্বের। সস্তায় নার্সিংহোম, বাজে ডাক্তার, যদি মরে যায় ? তেমনও তো হয়।

—বেশ! তবে মেয়েটাও হাজার টাকা নিয়ে গেল। এতেও খরচ

লাগবে···

—এমন কত হাজার এ সব ক্ষেত্রে যায় ভাই। এখানেতো তুমি হাজার দুইয়ে পার পাবে।

—তাই হোক কেষ্টকালী। দুই হোক, তিন হোক, কেচ্ছাটা সামলে দাও। কান মলছি যে আর কখনো ভুল করব না। তোমার হাত ছুঁয়ে বলছি, আর যুবতী ঝি রাখব না। আর নয়।

—মনে থাকবে?

—থাকবে, থাকবে। ওঃ, কুঙ্কুম জানলে···

—জানবে কেন?

—সেই বলছি।

অর্জুন ঘনঘন ঘাম মোছেন কপালের, ঘাড়ের, গলার। জীবন! মোহময়ী জীবন! কাল অবধি অর্জুনবাবুর প্রাসাদ ছিল সুরক্ষিত। ব্যবসা তুঙ্গে, স্ত্রী সন্তানসম্ভাবিতা, পাওনা টাকা টপাটপ পাচ্ছেন, কখনো মনেও হয় নি যে এমন প্রাসাদের ভিত ফাটবে, বেরিয়ে আসবে কঙ্কাল। অথচ তাই হ'ল। সকালে যমুনা···

—জ্যোতিষীটাকে পালটাব ভাই। সে তো ঘুণাক্ষরেও বলে নি যে কোনো বিপদ আসতে পারে।

—এ স্বভাব ঠিক নয় অর্জুন। জ্যোতিষে বা অত বিশ্বাস কেন? আর, তোমার দোষে তুমি বিপদে পড়ছ, দোষ করল জ্যোতিষী?

—যাক গে, যাক গে।

—এ সময়ে আমার দেয়া ওষুধটা আর খেও না। তেজস্কর ওষুধ।

অর্জুন মনে মনে এখন দায়িত্ব ভাগ করে ফেলেন। জ্যোতিষী দায়ী, সে একবারও বলে নি, আসিছে তোমার দুঃসময়! কেষ্টকালীও দায়ী। সে এমন এক তেজস্কর ওষুধ দিল যে সর্বদা তাঁর মনে···যমুনাই কি দায়ী নয়? কেন, কেন তার এমন দেহ, চলন বলন?

—কি ভাবছ?

—তোমার ওষুধে কি গণ্ডারের শিং থাকে ?

—এটা বিজ্ঞানের যুগ অর্জুন। আয়ুর্বেদ শাস্ত্রও আজ বিজ্ঞানের ওপর প্রতিষ্ঠিত। তা ছাড়া, ওষুধ কি দিয়ে তৈরি, তা কেউ বলে না।

—থাক, বোলো না।

—গণ্ডারের শিং! ওঃ, কত হোকাসপোকাস বিশ্বাস করতে পারো!

—ওকে কাল নিয়ে আসব ?

—সকালে আমাকে ফোন করবে। আজ বেশি রাতে আমি ডাক্তারকে পাব। কথা হবে তখন। তুমি সকালে ফোন করলে আমি সঠিক জানাতে পারব বিকেলে বা দুপুরে কখন ওকে আনছ। এমনও হতে পারে যে সরাসরি নার্সিংহোমেই নিয়ে গেলে।

—আমি!

—নয় তো কে, আমি ?

—মেয়েটার ভাইদের কথা ভাবলে···

—আর ভাবছ কেন ?

অর্জুন কিছুতে ভাবতে পারেন না সব দোষটা তাঁরই। অনেক লোককে দায়ী করতে চায় মন।

—যেমন পুলিশ, তেমন সরকার !

—সরকার আর পুলিশ কি করল ?

—কেন, কেন, বস্তিগুলোর ওপর চোখ রাখে না ? কেন সেখানে মস্তান থাকে ? আমরা নাগরিক নই ? আমাদের কথা ভাবতে হবে না ? সাত আট বছরে কতগুলো মালটি স্টোরি বাড়ি উঠেছে, বর্ণমালা, সৌরভ, গ্রীনলাভ, আশ্রয়। সে সব বাড়িতে সভ্য ভদ্র মানুষ আসছে, তাদের নিরাপত্তার কথা কে ভাবে ?

—হ্যাঁ। সভ্য আর ভদ্র ! আরে ! তোমাদের কথাই তো ভাবে। বর্ণমালায় চারটে ঝি মরল। কার হাতে হাতকড়া পড়ল ? চিন্তা কোর না। তুমিও এক হাতে তোমার ঝিকে খুন করো। আরেক হাতে থানায়

টাকা ঢালো, দেখবে, বুঝবে যে, তোমার পাশে পুলিশ আছে।
—আমি কি তাই বলছি ?
—বড়লোক চিরকালই পার পায় ভাই।
—মেয়েটার স্বামী বা কেমন লোক ? জানো যে তোমার বউ একটা জ্যান্ত বোমা। তাকে ফেলে রেখে তুমি ঘোরো কেন ?
—যথেষ্ট হয়েছে অর্জুন। একে বলে ন্যাকামো করি প্যাখম ধরি। নিজে অন্যায় করেছ, সে জন্যে লজ্জা পাবে, তা নয়—জ্যোতিষী, আমি, মেয়েটা, তার স্বামী, সরকার, পুলিশ, সবাইকে দায়ী করছ।
—মাথার কি ঠিক আছে ?
—নাও, এই ওষুধটা রাখো।
—খেয়ে নেব ?
—এখন নয়, বাড়ি গিয়ে শোবার সময়ে খেও। বেশ শান্ত লাগবে।
—শান্ত লাগবে ?
—হ্যাঁ হ্যাঁ, শান্ত হবে, ঘুম পাবে।
—বাঁচালে ভাই।
কেষ্টকালী এতক্ষণে পুরনো বন্ধুর মতো সহৃদয় হন। নরম গলায় বলেন, অত বিচলিত হলে তোমারই ক্ষতি। এখনো তো বিপদ কাটে নি।
—সত্যি, মহাবিপদ। কেচ্ছাকেই ভয় পাই বেশি। ওই বর্ণমালাতেই কত-জন আমাকে হিংসে করে জানো না। দুর্গাপুজো হয় প্রতিবছর। আমি দুর্গাকে ভাই জড়োয়া নথ দিই। যত দাম লাগে লাগুক। হাজার টাকা চাঁদা আর জড়োয়া নথ দেবই দেব। এ বছর দত্ত গিন্নি বলছে, নথ দিয়ে সেরে দিচ্ছেন কেন ? মাকে আপনি সোনার মুকুট দিন।
—ভালোই তো বলেছে।
—ভালো মনে তো বলে নি। হিংসে সব, হিংসে। এখন এ কেচ্ছা জেনে গেলে সবাই কি মজাটা পাবে, কি কাণ্ড করবে—দত্ত গিন্নির ভাই আবার সাংবাদিক—পরাক্রম সিনহা। সে ছেলে জানলে পরে…

—না না, সে সিরিয়াস সাংবাদিক। কার ঝিয়ের কি হল, এ সব সে লেখে না।

—তবু মনে হয় ভাই।

—অত ভেবো না। বিপদ আসে, কেটেও যায়। যেটা দরকার তা হল আত্মসংযম, সামলে চলা। সেটা করো।

—ওর ভাইদের কথাই মনে হচ্ছে। জানো না তো, কি রকম হিংস্র ওরা। কুঙ্কুমদের লেডিজ্ ক্লাব থেকে বস্তির ছেলেমেয়েদের জামা প্যাণ্ট দিতে গেল, তা বলছে, জয় বাংলার জামাকাপড় বস্তা ধরে কিনেছেন তো? নিয়ে যান, নিয়ে যান, ও সব আমরাই কিনতে পারি।

—তা ওদের সামনে তোমরা বাড়ি-গাড়ি হাঁকাবে। ওরা হিংস্র হবে না?

—মিসেস দেশাইয়ের মাথা খারাপ। একদিন উনি বুঝি ছোকরা চাকরকে কি বলেছেন, পিলপিল করে ওরা দশ বারোজন মহিলার স্বামীকে রাস্তায় ঘিরে ফেলল।

—ও সব ভেবো না। মেয়েটির অপারেশন হয়ে যাবে। পরদিনই চলে যাবে। নয় আর কিছু টাকা দিয়ে ওকে বিদায় করে দিও।

—সে তো দেবই। এমন মেয়ে, বলে কোথায় টাকা রাখো, সব জানি।

—মাইনে নেয় কত?

—জানি না। বোধহয় একশো টাকা। একশোর নিচে ওখানে ঝি বাসনছোঁবে না। ওদেরই তো দিনকাল এখন। ও বাড়ি টি. ভি. নেই। কাজ করব না। মেশিনের ঠাণ্ডাজল ছাড়া খাব না। বছরে চারবার জামা কাপড় দিতে হবে…

—তা তো হবেই। আমাদের এখানেও খাঁই বেড়েছে, তবে অতটা নয়। ওদের বা কি বলব! বাজার যেমন চড়া। জিনিসপত্র যেমন দামী…তবু আমাদের তো গেরস্ত পাড়া। একটু নরম আছে।

—তোমার সৌভাগ্য ভাই। বউদি নিজে রাঁধেন বাড়েন, দেখেছি তো।

—আর অম্বলে ভোগেন! ওটা তো ওঁর বাতিক। রান্না উনি ছাড়বেন

না। পুজো, রান্না, অবেলায় খাওয়া, অম্বল ধরবে না ?

—উঠি ভাই। বউয়ের কাছে যেতে হবে। ওখানে রাতে খেতে হবে।

—এসো।

—পঁচিশ বছর ওর বিয়ে হল। পঁয়ত্রিশ বছরে গর্ভধারণ করেছে, বেশ তো, সুসংবাদ। কিন্তু কি রকম "তুমি তুমি" বেড়েছে, ভাবতে পারবে না। আমাকে রোজ ফোন করবে, আমাকে যেতে হবে, যাবার কালে ফুল নিয়ে যেতে হবে।

—এ সব তো স্বাভাবিক হে!

—স্বাভাবিক নয় ভাই। কুঙ্কুম আজ যেমন করছে তা স্বাভাবিক নয়। বউদি কি এমন করতেন নাকি ? তুমিই বলো।

—আমাদের কথা ছাড়ো। সেকেলে বাড়ি। রাত না হলে তখন বউয়ের সঙ্গে দেখা হতো না। বিয়ে হয় অল্প বয়সে। ছেলেমেয়েও অল্প বয়সেই হয়। দেখ না, তুমি আমি দুজনেই বয়সে চুয়াল্লিশ। আমার বড় মেয়ের বয়স বাইশ, বিয়েও দিয়েছি। সেদিন দাদুও হয়েছি। ছেলেরা তো জানো যমজ। দুজনেই বি. কম. দিয়ে সি. এ. করছে। ওদেরও কুড়ি হয়ে গেল। ছোট মেয়েটার সতেরো।

—বউদি এমন ন্যাকামো তো করতেন না ?

—আরে! বাড়িতে বউদি বৃহৎ সংসারে বড় বউ, আর ছেলে মেয়ে হয়েছে বাপের বাড়ি। ও সব "তুমি তুমি" করার চলই ছিল না। তুমি তো এখানে ছিলে। ক'দিন আমার বোনদের চোখে দেখেছ ? খুব কড়া-কড়ি ছিল।

—কুঙ্কুমের এখনকার গদগদ ভাব স্বাভাবিক নয়। আজ দশ বছর ধরে ও আমাকে "নপুংসক" বলেছে, ভাবতে পারো ?

—বড় দুঃখ পেলাম। স্বামী-স্ত্রী···শ্রদ্ধা ভক্তি থাকা চাই।

—কথায় কথায় বলবে, আমার কালচার নেই, আমি শুধু টাকা চিনি।

—এ সব ভালো নয়। দেখ, ছেলে হলে অন্য রকম হয়ে যাবেন। মনে

একটা দুঃখও তো ছিল। সেইজন্যে ও সব বলতেন।

—তোমাকে ওই সব ছাতামাথা রেঁধে খাওয়ায়। তুমি তো ওকে সমর্থন করবেই।

—-বাড়িতে যে সব খাই না, সে সব তোমার বউ…রাঁধেও ভালো।

—হ্যাঁ হ্যাঁ। বই পড়ে স্প্যানিশ মাংসের কারি। মেক্সিকান জগাখিচুড়ি রাঁধে। আমার পছন্দ কলাই ডাল, আলু পোস্ত, মাছের অম্বল…সে সব তো ভুলেই গেছি।

—একবার তোমার বউদির কানে গেলেই হয়। ভাই রে! আমি তো ওই সব খেয়ে খেয়ে তোমার ওখানে মুখ বদলাতে যাই। অন্দরে তো ওঁর রাজত্ব। গরম পড়ল তো নিম বেগুন। কাঁচা আমের ঝোল, বর্ষা পড়লে কচু শাকের ঘণ্ট…

—বোলো না, বোলো না। আমার বাড়িতে সজনে ডাঁটা, নিমপাতা, কচু শাক, এ সব ঢোকে না। ওগুলো নাকি অখাদ্য খাওয়া।

—কনভেন্টে পড়া শাশুড়ি, কনভেন্টে পড়া বউ। সে সবও চাই, আবার সজনে ডাঁটাও চাই, সব চাইলে চলবে কেন?

—উঠি। ফুল না কিনলে আবার কান্নাকাটি করবে। এখন কথায় কথায় কান্না! আজ তুমি যেমন গদগদ করছ, ঠোঁট কাঁপিয়ে কথা বলছ, সতেরো বছরের মেয়ের মতো খুকিপনা করছ। এর সিকির সিকি মনোযোগ যদি দশ বছরে দিতে, তাহলে কি আমার আজ এ অবস্থা হয়?

—অবস্থা মন্দ কি? বর্তমানে অবশ্য প্যাঁচে পড়েছ, তাও বেরিয়ে আসবে।

—কুঙ্কুম হাজার হলেও ফিলসফিতে এম. এ. পাশ করেছে। বয়সও পঁয়ত্রিশ। এদিকে ভরাভর্তি আটমাস। এখন আবদার ধরেছে, বাপের বাড়িতে জাঁকজমকে বিবাহবার্ষিকী করতে হবে। এ সবের কোনো মানে হয়?

—দাম্পত্য…মাতৃত্ব…ভারতীয়ত্ব…

—তোমার মাথা!

অর্জুনবাবু হালকা মনেই বেরিয়ে আসেন। না, যেমন মন নিয়ে এসে-ছিলেন, তেমন মন এখন নেই। কেষ্টকালী ঠিকই বলেছে। নার্সিংহোমে গোপনে অপারেশন হবে, কেউ জানবে না। দরকারে আরো টাকা দিয়ে যমুনাকে বিদায় করবেন।

যমুনাকে আর দেখবেন না, ভাবলেও দুঃখ হচ্ছে। কিন্তু কি আর করা যায়। জজসায়েবের বেঁটে মোটা মেয়ে কুঙ্কুমকেই দেখে যাবেন বাকি জীবন।

ফুল কিনতে হবে, ফুল! এ বয়সে প্রেমময় স্বামীর ভূমিকায় নামা রীতিমতো কষ্টকর। তবু ফুল চাই।

"কে নিবি ফুল! কে নিবি ফুল!

বেলা মালতী চাঁপা যূথী

মাতোয়ারা অলিকুল!"

আচ্ছা, এই আজিকেসেগানটা মনে পড়ছে কেন? মনটা হালকা লাগছে বলে?

গাড়ি থামিয়ে এক তোড়া গোলাপ কিনে নেন। এই গোলাপ মাথায় দিলে যমুনাকে কেমন দেখাবে? সেই সঙ্গে যদি হলদে নাইলন পরে? না, যমুনার কথা ভাববেন না অর্জুনবাবু। এই যে এখনো ভাবছেন, এর কারণ হ'ল কেষ্টকালীর ওষুধ। ওর ওষুধ খেয়ে খেয়েই তো···

মন! সংযমী হও।

ক্যামাক স্ট্রীটের "হারবার" বাড়িতে পৌঁছে যান অর্জুন বাবু।

৫

লিফট ওঁকে সাঁ করে আটতলায় নিয়ে যায়। আটতলায় ওঁর শ্বশুর থাকেন। প্রতি ফ্ল্যাটের দরজায় তিব্বতী বাঘ-সিংহ-দৈত্য-দেবতার পেতলের মুখ। ঘণ্টার শব্দটাও আশ্চর্য সুরেলা। যেন পিয়ানো বেজে

ঘণ্টা বাজতে দরজা খুলে দেয় ভাস্বতী। ভাস্বতী ওঁর একমাত্র শালার বউ। ভাস্বতীর মুখ ঘোড়ার মতো লম্বা, দাঁতও বড় বড়।

কিন্তু ভাস্বতী হ'ল মহিলা ব্রিজ চ্যাম্পিয়ান। ইংরিজি কাগজে ব্রিজ খেলা নিয়ে নিয়মিত লেখে, কম কথা নয়। তা ছাড়া কোন একটা আপিসে ও জনসংযোগ অফিসার।

ভাস্বতী আজ দুষ্টু দুষ্টু হাসে।

—দেরি করেছেন কেন?

—দেরি করলাম খুব?

—গিন্নি রেগে আগুন।

—তুমি এখানে?

—বা রে, আমরাও তো খাচ্ছি। কুঙ্কুম ফোন করে বলল, আমি আবার ওর ফরমাশ মতো "ফিরোজ" থেকে তন্দুরি চিকেন করিয়ে আনলাম, দেখবেন কি চমৎকার।

ভাস্বতীর বয়স নিশ্চয় আটত্রিশ হবে। লাল ঢাকাই শাড়ি, লাল জামা,

মোষেরগাড়ির চাকার মতো দুটো সোনার কানবালা, মস্ত সিঁদুরটিপ।
—নতুন বউয়ের মতো সেজেছি।
—তাই তো!
অর্জুনবাবু মনে মনে বললেন, তুমি যে হোটেলে যাও রণধাওয়ার সঙ্গে, আমিও সেখানেই মক্কেলদের নিয়ে মদ খাওয়াই। চারদিন তোমাকে ওখানেই দেখেছি। চারদিনই তুমি নাকি আপিসের ট্যুরে বাইরে ছিলে। কানবালা দুলিয়ে অর্জুন চক্রবর্তীকে ভোলাতে যেও না, পারবে না।
বসার ঘরটি মস্ত বড়ো। শ্বশুর সুপ্রীম কোর্টের জজ ছিলেন। ঘর সাজিয়েছে কোনো গৃহসজ্জার আপিস। ফলে চেয়ারগুলো অদ্ভুত, টেবিল অদ্ভুত, পর্দায় পর্দায় হিংস্র ড্রাগন আগুন ছোটাচ্ছে নিশ্বাসে। এ ঘরে দেয়ালে কাচের আড়ালে পেতলের সিংহবাহিনী দুর্গার মূর্তিও গৃহসজ্জার আভরণ।
চেয়ারগুলো যেন বহির্বিশ্বে মঙ্গলগ্রহে তৈরি। তেমনি বাঁকা তেড়া চেহারা।
তেমনি একটি চেয়ারে ডুবে বসে আছে কুঙ্কুম। সাদা ছাপা শাড়ি, সাদা জামা, গলায় মুক্তো, চুলে মুক্তো। অর্জুন এগিয়ে যান। ফুলের তোড়াটি এগিয়ে ধরেন।
কুঙ্কুম কি ভেবেছে কি? ফুলের তোড়াটা ও মোটেই ধরে না। উনি ধরে থাকেন। ও ফুলে মুখ ডোবায় আর নিশ্বাস টেনে বলে চলে, ডার্লিং! ডার্লিং!
ভাস্বতী বলে, ফুলগুলো ধরো।
—তুমি ওগুলো রাখো বউদি। ওগো! তুমি আমার পাশে বোসো। এত দেরি করেছ, ভেবে ভেবে আমি তো সারা!
—অত ভাবো কেন?
—বা! তোমার জন্যে ভাবব না?
—তুমি তো জানো সোনা, আমার কাজ থাকে সবসময়ে।

এই সময়ে গৃহকর্তা, প্রাক্তন জজসায়েব বলেন, যত কাজ থাকুক, আমার মিমিসোনাকে তো মনোযোগ দিতেই হবে।

কনভেণ্টে পড়া শাশুড়ি একসময়ে টগবগিয়ে ঘোড়া চড়তেন এবং একই সঙ্গে "নেতাজী জিন্দাবাদ' গান গাইতেন। একই সঙ্গে দিল্লীতে হরদম পার্টি দিতেন, জনসংযোগ করতেন। লোকে বলে ওঁর ঠেলাতেই স্বামী সুপ্রীমকোর্টে জজ হন।

এখনো ওঁর চুল ছাঁটা, বাষট্টি বছর বয়সেও দোকানে গিয়ে মুখচর্চা করেন। রীতিমতো টনকো শরীর। সকালে লম্বা জজ সায়েব ও বেঁটে জজ গিন্নি দুজনেই রাস্তায় দৌড়ে বেড়ান।

এমন এক মহিলার নাম কেন রুনুঝুনু, তা অর্জুন জানেন না।

শাশুড়ি কথা বলেন সর্বদা বক্তৃতার ভঙ্গিতে। যেন জাতীয় রাষ্ট্রসংঘে আফ্রিকা বিষয়ে বলছেন। এমনই গলায় বলেন, পঁয়ত্রিশ বছরে প্রথম মা হওয়াটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। ওর দেহের কষ্ট আমরা কমাতে পারি না। তবে কোনো কারণে মনে যাতে টেনশান না হয়, সেটা দেখতে পারি। মেয়েদের ব্যাপারে পুরুষরা এমন উদাসীন! এটা ভারতেই সম্ভব।

শাশুড়ি ও শ্বশুর একটা কনডাকটেড ট্যুরিস্ট ট্যুরে একমাসে ইউরোপ ও আমেরিকা দেখে এসেছেন। বিদেশের পুরুষ ও ভারতীয় পুরুষ বিষয়ে তুলনামূলক আলোচনা করার অধিকার ওঁর আছে।

জজসায়েব চুরুট নামিয়ে বলেন, কাজ থাকে, কাজ থাকে! অর্জুন তো দশটা-পাঁচটা করে না। ওর কাজ থাকে। তা ছাড়া, চুয়াল্লিশ বছর বয়সে প্রথম বাপ হবার টেনশানও কম নয়, সেটা মনে রেখো।

এ সব কথাবার্তার সময়েও অর্জুন কুঙ্কুমের হাত ধরে বসেই আছেন। কুঙ্কুম মাথাটি হেলিয়ে ওঁর কাঁধে রেখেছে।

ইস, কি নির্ভরতা ওঁর ওপর, কেমন নিশ্চিন্ত ভাব! এমন কুঙ্কুম থাকতেও কেন অর্জুন যমুনার দিকে ধাবিত হয়েছিলেন?

মনের ভেতর মন এখন ম্যাজিক দেখায়। সনাতন পুষিলাল আর অর্জুন

কুঙ্কুম ছোট্ট খুকির মতো হাসে।

—আজ তোমার কি হয়েছে বল তো? আমি কাছে না থাকলে তুমি কি সব ভুলে যাও?

—কি ভুলে গেলাম?

—ডাক্তার চৌধুরী কোথায় গো! এখন তো চার মাস হ'ল ডাক্তার রায় দেখছেন।

অভিনয় করতে হবে, অভিনয়। নইলে কে কোন্ ভাবে জেনে যাবে সব কথা!

—ডাক্তার রায়ই বটে। আজ ওই ব্রিজের ব্যাপারটা নিয়ে এত কথা কাটাকাটি করতে হয়েছে, এত বারবার বোঝাতে হয়েছে, যে পারা যাচ্ছে না। মাথা যেন খারাপ করে দেবে।

শ্বশুর আজকাল কাগজ পড়েই সব খবর রাখেন এবং তিনি কেন যেন কাগজের প্রতিটি খবরে যা বেরোয়, তার চেয়েও বেশি খবর জানেন বলে মনে করেন। এখন তিনি মাথা নাড়েন।

—ইঞ্জিনিয়াররা গোল পাকাচ্ছে তো?

ঘটনা তা নয়। তবু অর্জুন এখন "হ্যাঁ" দিয়ে যাবেন। ওটাই নিরাপদ।

—বলেন কেন!

—সরকারী ইঞ্জিনিয়াররা যদি এ ভাবে বাগড়া দেয়, আমি তোমায় বলে দিচ্ছি অর্জুন, রুনু, তুমিও শোনো! ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, এরা যদি বাগড়া দিতে থাকে। তাহলে এই স্বাধীনতার স—ব নষ্ট হবে।

কুঙ্কুম মিষ্টি আপত্তি জানায়। বাপী!

—না না, তোমার সামনে কোনো কাজের কথা বলা ঠিক হয় নি মিমিসোনা।

অর্জুন বলেন, ডাক্তার বিষয়ে আমার কি আলাদা মত থাকবে বলুন। আপনারা ঠিক করেছেন। আপনারা সবাই আছেন, আমার তো কেউ নেই। আপনারাই আমার ভরসা।

ভাস্বতী বলে, সে কথা ঠিক।

কুঙ্কুম বলে, বউদি! তোমার যখন বিবি হয়েছিল, আমার মতো নার্ভাস হয়েছিলে?

ভাস্বতী ঘোড়ার মতো হাসে।

—কুঙ্কুম! ওয়ার্কিং ওম্যানরা নার্ভাস হয় না। আর আমার কাকাই ডাক্তার রায়, সেটা ভুলে যেও না। আমার কিছু ভয় করে নি।

—তোমার মা অবশ্য···

· মা ভীষণ শক্ত। বাড়িতে আমরা মাকে "সোলজার" বলতাম, বাবা বলতেন "ক্যাপটেন"।

অর্জুন মনে মনে বলেন। তুমিও কম মেয়ে কাপ্তেন হওনি ভাস্বতী। রীতিমতো উড়ছ, অনেক দিনই উড়ছ, আমি সব জানি।

কুঙ্কুম বলে, বাড়িতে আমি না থাকলে তোমার সব গণ্ডগোল হয়ে যায়!

মন বলে. ন্যেকু খুকুমণি! বাড়িতে থাকতেই বা কতক্ষণ, আমাকে দেখ-তেই বা কতটুকু! সব সময়ে তো হুল্লোড়ে মেতে থাকতে; কালচার করতে।

মুখ বলে, তুমিই তো আমার···

শ্বশুর বলেন। ড্রিংক্‌স, অর্জুন? ভাস্কর?

আর ভাস্কর চেঁচিয়ে ওঠে, প্রেগনাণ্ট! প্রেগনাণ্ট!

অর্জুন ভয়ানক ঘাবড়ে চেঁচিয়ে ওঠেন। কে? কে?

ভাস্কর "স্টেট্‌সম্যান" নাচিয়ে বলে, ক্রসওয়ার্ড হে, ক্রসওয়ার্ড! এই একটা শব্দের জন্যে আটকে গেছলাম। তা তুমি চমকে উঠলে কেন? মিমি তো অনেকদিনই···

শ্বশুর বলেন। থামো তো!

শাশুড়ি বলেন, একটা রাউণ্ড, ব্যস।

—স্কচ অন রক্‌স?

—তাই চলুক।

—আমি জিন উইথ লাইম !

—ভাস্বতী জিন ; রুনু, তুমি ?

শাশুড়ি কঠোর গলায় বলেন, ব্রাণ্ডি।

—মিমিসোনা ?

—জিরাপানি বাপী !

—তবে রিমঝিম খাও।

স্কচ গলায় ঢেলে তবে অর্জুন স্বস্তি পান। ভাস্কর "প্রেগন্যাণ্ট" বলতে এত ভয় পেয়েছিলেন যে বলার কথা নয়।

ভাস্বতী জিন উইথ লাইমে চুমুক দিচ্ছে।

রুনুঝুনু খাচ্ছেন ব্রাণ্ডি।

কুঙ্কুম রিমঝিমে ঠোঁট ছোঁয়াচ্ছে আর ওঁর দিকে চাইছে বেড়ালের মতো।

ভাস্কর আবার ক্রসওয়ার্ডে ডুবে গেছে।

শ্বশুর বলেন, ভাস্কর! ক্রসওয়ার্ড করতে চাও তো "টেলিগ্রাফ" রাখো।

– রাখি। করে ফেলেছি। দাঁড়াও, এটা······

কুঙ্কুম আদুরে গলায় বলে, ডিনারে দেরি কোর না মা। ওকে তো ফিরতে হবে।

ভাস্বতী বলে, আমরাও ফিরব।

—তোমরা তো পার্ক স্ট্রীটে। ও কত দূরে যাবে বলো তো ?

ভাস্বতী বলে, আজ তাড়াতাড়িই ফিরতে চাই। যা কাণ্ড হয়ে গেল বারো নম্বরে !

—কি হল ?

—আয়া স—ব চুরি করে পালিয়েছে। আচ্ছা, ঝি-আয়া-চাকর সব যদি হরদম চুরি করে, তাহলে এত টাকা আমরা সিকিউরিটি সার্ভিসকে কেন দিচ্ছি ? এটা নিয়ে তিনবার হল এক বছরে।

শাশুড়ি বলেন, বাড়িতে কেউ থাকবে না। সব ফেলে রেখে চলে যাবে···

ভাস্কর বলে। ওয়ার্ক ইজ ওয়ার্ক মা ! তোমার মতো ভাগ্য কার, বলো ?

সেই বাবুর্চি, সেই মেইড!

—আমার ভাগ্য সত্যিই ভালো।

কুঙ্কুম বলে। আমারও!

ভাস্বতী বলে, সবাই ঠিকে লোক তো?

—হ্যাঁ হ্যাঁ। মোহিনী রান্না করে দিয়ে যায়···হ্যাঁ গো! মোহিনী ঠিক-মতো সব করছে তো?

—স—ব করছে।

—তোমাকে তো যা দেবে তাই খাবে। আমি কেমন রোজ নতুন নতুন রান্না করতাম!

মন বলে, ছাই করতে। বই পড়ে রান্না করা, সেও হতো অখাদ্য।

মুখ বলে, তোমার মতো কি পারে?

—তাও তো বলে এসেছি, আজ এটা কোরো, কাল ওটা কোরো। বাহাদুর ঠিকমতো ঝাড়-পোঁছ করছে তো?

—খুব ভালো কাজ করছে।

—কিছু যেন না ভাঙে।

—না না, আমিও চোখ রাখি।

—যমুনাকে নিয়ে অবশ্য ভাবনা নেই।

—কে, সেই ব্রিজিত বার্দো?

—কি যে বলো বউদি! যমুনা ভীষণ ভালো। কাপড় কাচে কি সুন্দর, ইস্ত্রি করে চমৎকার, আর অত বড় বাড়ি যে ভাবে মোছে! আমার চুলে শ্যামপু করে দেয়, চুল আঁচড়ে দেয়।

—দেখতে দারুণ, যাই বলো।

—স্বামীকে কি ভালোই না বাসে! অথচ স্বামীটা এদিকে বেকার, ওদিকে মেজাজী।

রুমুঝুমু কঠোর গলায় বলেন, ওই জন্যেই তো এ দেশে মেয়েদের কিছু হবার নয়। স্বামী বেকার। তবু মেজাজটি আছে। বউ খেটে খাওয়াবে,

তাতে লজ্জা নেই। খেতে দেবার মুরোদ নেই। এক পাল ছেলে মেয়ে হবে।

কুঙ্কুম হেসে গড়িয়ে যায়।

—মা ! যমুনার এখনো ছেয়েমেয়ে হয় নি। বিয়েও তো বেশিদিন হয়-নি। রীতিমতো ভালবাসার বিয়ে। যমুনাকে দেখলে বুঝতে।

—দেখব না কেন ? সবাই দেখেছি। তুমি মিমি ! একটা তফাৎ রেখে ব্যবহার করো। যা তুমি পরো, তাই ওকে পরাচ্ছ, এতে ওরা নষ্ট হয়।

—তা বলে তো ওকে যা-তা পরে কাজ করতে দিতে পারি না। ঝি-চাকর ভালো পোশাক না পরলে আমাদেরও ইজ্জত থাকে না, দেখতেও ভালো লাগে না।

ভাস্বতী ঘোরালো হেসে বলে। আমি তো তোমার যমুনাকে ব্রিজিত বার্দো বলি। মডেলিং করতে পারে ?

কুঙ্কুম আদরে গোবরে নষ্ট, তবে ওর বুদ্ধি তেমন প্রখর নয়, মনটাও সরল।

—মডেলিং করবে কেন ? আমার কাছে কাজ করে কত খুশি। বলে, আরো বাড়িতে কাজ করি, তোমার মতো মনপ্রাণ কারো নয় বউদি।

—দেখো ! অত বিশ্বাস ভালো নয়।

—না বউদি ! ও অন্য রকম। মা বাবাকে বলে দাদু, দিদিমা। তোমাদের বলে মামা মামী !

—তোমার কর্তাকে কি বলে ?

অর্জুন ছটফট করছিলেন।

—আচ্ছা, যমুনার গল্প কি ফুরোবে না ? তোমরা আর কথা পেলে না ?

কুঙ্কুম বলে, বিশ্বাসী ভালো লোক পাওয়া যে কত ভালো, তুমি বোঝ না ? এই যে আমার জন্যে ও নিজে থেকেই পুজো দিয়ে এল, সেটা তো ওর চাকরির মধ্যে পড়ে না।

ব্রাণ্ডি শাশুড়িকে নরম করে।

—মিমি চিরকাল ওই রকম ! আয়া-মালী-বেয়ারা, সকলকে ভালবাসত।

বলত, আমার জন্মদিনে ওদেরও কাপড় দাও!
ভাস্বতী বলে, এ সব কথায় দেরি হয়ে যাচ্ছে মা! এবার খেলে হয়।
শ্বশুর হঠাৎ বলেন, বর্ণমালায় সিকিউরিটি সার্ভিস কি রকম, ভালো তো?
—ভালোই তো মনে হয়!
শাশুড়ি উঠে যান। বসার ঘর খাওয়ার ঘর এ বাড়িতে এক নয়। জজ সায়েবের বউ বরাবর সরকারী বাড়িতে বাস করেছেন। এ বাড়িতেও যতটা সম্ভব পুরনো কেতাব বজায় রেখেছেন।
খাবার ঘরটিও বড়োসড়ো। টেবিলে বসেন সবাই। কুঙ্কুম বলে, এই, ভালো করে খাও!
—খাচ্ছি তো।
—তন্দুরিটা বউদি এনেছে। আর জাফরানি পোলাও, চিংড়ি মাছ ভাপানো···
—এত খাওয়া যায়?
—কি জানি! আমার ভীষণ ইচ্ছে করল, আমার যা যা ভালো লাগে, সব আজকে হবে। তা তো হতে পারে না, আমার তো এখন সব চেয়ে ভালো লাগে আনারস খেতে। ঠাণ্ডা আনারস, ঠাণ্ডা ক্রীম ঢেলে দাও। ব্যস্ চমৎকার।
—আনারস? তুমি আনারস খাচ্ছ?
—কেন খাব না?
—কেষ্টকালী বলে···
—ও সব কথা ছেড়ে দাও তো। ডাক্তার বলেছেন, যা ভালো লাগবে তাই খাও।
শ্বশুর চিংড়ির টুকরো কাঁটায় ঝুলিয়ে রেখে বলেন, অর্জুন! তোমার বন্ধু ভালো কবিরাজ হতে পারে। তা বলে সে সব জানে না।
ভাস্কর বলে, ও সব ধাপ্পা!
কুঙ্কুম বলে, ইস! তুমি কি সব জানো?

ভাস্বতী বলে, যার যাতে বিশ্বাস।

এ টেবিল ঘুরন্ত টেবিল। একটি খাবার তুলে নিয়ে অন্যের দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া চলে। মজা হচ্ছে, টেবিলের মাঝে একটি ঘুরতে সক্ষম কাঠের গোল ঝকঝকে টুকরো বসানো। সেটি ঘোরালেই যে জিনিসটি চাও, সামনে এসে যাবে।

খাওয়ার শেষে পেঁয়াজের পায়েস আসে। পেঁয়াজের পায়েস কেন, তা ভেবে পান না অর্জুন।

—তা হলে অর্জুনবাবু?

—কি, ভাস্বতী?

—সে ব্যাপারটার কি হবে?

—কোন্, কোন্ ব্যাপারটার?

চমকে দিও না, চমকে দিও না তোমরা। আমার দরকার শান্তি, মনের স্থিরতা, নিরুদ্বেগ প্রশান্তি। না, কেষ্টকালীর ওষুধে হবে না। শেষ অবধি জামার পকেট থেকে সর্বচিন্তাহর ট্যাবলেট খেতেই হবে। কয়েক দিন খেয়েই অর্জুনবাবু ওর মাহাত্ম্যও বুঝেছেন। মনকে আকাশে উড়িয়ে দেয় একেবারে।

—আপনি সব কথায় চমকাচ্ছেন কেন?

—হ্যাড এ ভেরি ব্যাড ডে।

ভাস্কর সদয় হয়। বলে, তোমাদের বিবাহবার্ষিকীর কথাটা বলছে ভাস্বতী।

—বেশ তো, কুঙ্কুম চায়, হবে।

—তুমি চাও না?

—কুঙ্কুম চাইলেই আমার চাওয়া হল।

শাশুড়ি সগর্বে ভাস্বতীর দিকে তাকান। দেখ, দেখ, আমার জামাই আমার মেয়ের কত অনুগত। তোমার স্বামী কি তাই?

ভাস্কর চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট। মনে মনে কি হিসেব করে বলে, আমার একটা প্রস্তাব আছে। সবাই শুনবে, "হ্যাঁ" বলবে।

ভাস্বতী বলে, তা কেন হবে?

—শোনোই না।

—বলো দাদা, আমি শুনছি।

—শুধু মিমি আর অর্জুন নয়। আমরা এতদিন বাবা-মার বিবাহবার্ষিকী-তে স্টেট্‌সম্যানে একটা আনন্দবার্তা ছাপাই, বাবা-মা-মিমি-তোমার ভাই, আমাদের বিবাহবার্ষিকীতে আনন্দবার্তা ছাপায়। এ বছর আমি মামা হতে চলেছি। খুব শুভসংবাদ। এবার মিমিদের বিবাহবার্ষিকী হোক, আমাদের হোক, বাবা-মারও হোক। কেন হবে না?

ভাস্বতী বলে, আমি খুব রাজী। তবে···

—কি?

—মাকে বেনারসী পরতে হবে।

—পরব।

"পরব" কথাটি মহিলা এমন সুরে বলেন, যেন বলছেন, "দেশের জন্যে শহীদ হব।"

ভাস্কর বলে, না না, এটা আমাদের কর্তব্য। যে সব দম্পতির বিয়ে সার্থক বিয়ে, সেগুলোকে নিয়ে উৎসব করা উচিত। বিশেষত আজকাল যখন···

ভাস্বতী পায়েস চেটে বলে, কি?

—যখন এত বিয়ে ভেঙে যাচ্ছে।

—বাইরে দেখেই কি বোঝা যায়?

—একসঙ্গে বহু বছর কাটালে বোঝা যায়।

অর্জুনের হঠাৎ হাসি পায়। কেষ্টকালী কতকাল বিবাহিত? সুখী তো ওরাও। ওঁর রান্না করে যে মোহিনী, তার কথা যদি সত্যি হয় আর বয়স যদি ষাট হয়, পঞ্চাশ বছর ধরেই ও স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া করছে এবং স্বামীকে "মিনসে মরে না কেন" বলছে। ওদের বিবাহবার্ষিকী করা তো খুবই উচিত, তবে সে কথা ওরা জানে না।

কুঙ্কুম হঠাৎ বলে, মা ! মীরা ভার্গবের কথা মনে আছে ? তুমি কি রেগে গিয়েছিলে আগে, তারপর অবশ্য গেলে, আমার মনে আছে।

—রেগে গিয়েছিলাম, রাগ করার কথা। গিয়েছিলাম, সেটা সামাজিক কর্তব্য।

—কে মীরা ভার্গব ?

—ও, বউদি ! সে অনেক আগে ! দিল্লীতে। মীরা না, কাকে যেন বিয়ে করতে চেয়েছিল, সে বোধহয় মুসলমান···ভাবতে পারবে না, রাতে না কি তার হঠাৎ কলেরা হ'ল, সকাল হবার আগেই দাহটাহ শেষ। খুন করেছিল নিশ্চয় বিষ-টিষ খাইয়ে জানো ? সে কি ঢি ঢি পড়ে গেল !

জজসায়েব বলেন, মিমি ! কেসও হয়নি, কিছুই হয়নি, তাই "খুন" বলাটা ঠিক নয়। ও সব কথা বলার আগে ভাবতে হয়।

—সে তুমি যাই বলো। তার কয়েকদিন বাদেই ভার্গবরা কি ন্যাকামি করে বিবাহবার্ষিকী করলেন। মা খুব রাগ করেছিল।

অর্জুন আস্তে বলেন, ও সব কথা থাক।

—হ্যাঁ, আমাদের কথা হোক। যেমনই দেখাক, আমি নতুন বেনারসী পরবই।

ভাস্বতী বলে, তোমার কর্তার গাড়ি সেদিন ফুল দিয়ে সাজাব, সানাই আনব।

ভাস্কর বলে, হ্যাঁ হ্যাঁ, আনন্দ হোক।

অর্জুনও কেন যেন ভাবতে থাকেন, আনন্দ হোক, আনন্দ।

কুঙ্কুম বলে, এই ! তুমি কাল কি করছ ?

মুখে আসে, কাল যমুনাকে নিয়ে নার্সিংহোমে যাচ্ছি। কেন না, কুঙ্কুম, তার পেটে আমার সন্তান। এখন এ কেচ্ছা সামলানো বিশেষ দরকার।

—এই ! বললে না ?

—কাল ? কাল আমার মিটিংয়ের ম্যারাথন চলবে। তারপর সাইটেও যেতে হবে। কেউ ভাবতে পারে ? ওপেল কোম্পানি থেকে কাঠ নিচ্ছি

এতকাল। স্রেফ বাক্সে কাঠ চাপিয়েছে ?

—কাল আসবে না ?

—যদি পারি।

খাওয়ার পর হাত ধোয়া, আবার বসার ঘরে বসা। শাশুড়ি বলেন, মিমি! এবার তুমি শুতে যাবে। সময় মেনে চলতে হবে।

—এই তো যাচ্ছি। এই!

—বলো?

—এবার নতুন বাড়ির কথা ভাবো।

—কেন ?

—একটা বাচ্চা আসছে, ওটুকু জায়গায় কি তার কুলোবে? বড় তো হবে!

কুঙ্কুম! কুঙ্কুম! পঁচিশ শত বর্গফুট বাড়িতে একটা বাচ্চার জায়গা হবে না? একেকটা শিশুর জন্যে যদি পাঁচ হাজার বর্গফুট জায়গা দরকার হয়, তাহলে কত জায়গা দরকার? এ তুমি কি বলছ ?

—আরো বড় ফ্ল্যাট চাই?

—ফ্ল্যাট নয়, বাড়ি চাই, বাড়ি।

আহা-হা! গলে গেলাম। বাড়ি কি মুড়ি না ঘুড়ি যে দোকান থেকে কিনে এনে বউকে খুশি করতে হবে? সন্তানবতী হয়েছ, মনে সৎচিন্তা রাখো, ধর্মের কথা ভাবো। ধর্মভাব মনে রাখলে সৎসন্তান হবে। নইলে আমার মতো…

—দেখি, দেখা যাক।

—ও পাড়াটাই জঘন্য।

ভাস্করের আঁতে লাগে, ভাস্বতীরও। হতে পারে ভাস্কর ও কুঙ্কুম দুজনে দুজনের একমাত্র ভাই ও বোন। কিন্তু কুঙ্কুমের বাড়ি ওদের চেয়ে বড়ো, ওদের বাড়ি মোটে বাইশ শো বর্গফুট। ওদের মোটে একটা গাড়ি, যদিও ভাস্বতী অফিসে যায়, আসে অফিসের গাড়িতে। আর কুঙ্কুমের নিজের

হুটো গাড়ি, আর কণ্ট্রাক্টর অর্জুন চাইলে দশটা গাড়ি পায়।

কুঙ্কুমের জন্মদিনে ওরা তিনশো টাকার শাড়ি দিলে কুঙ্কুম দুজনকেই, ছেলেকেও, হাজার টাকার নিচে কিছু দেয় না। পুজোতেও তাই। আবার ন্যাকামি করে বলে, গরিব বোন। যা পারলাম, করলাম।

এ সব কারণে ভাস্কর ও ভাস্বতীর মনে হিংসে আছে, হিংসে আছে। ওর কেন আছে, আমাদের কেন নেই, এ নিয়ে দাম্পত্য কলহও হয়।

তা বলে গোটা একটা বাড়ি অবহেলে দাবী করা, পাড়াই ছেড়ে দেয়া?

ভাস্কর বলে, পাড়া জঘন্য কেন রে মিমি? এখন অর্জুনদের যুগ। ধপা-ধপ বর্ণমালার পর বর্ণমালা উঠবে, বস্তি হটে যাবে, চলে যাবে। তখন ও পাড়াই হবে অভিজাত পাড়া।

শাশুড়ি বলেন, মিমি! ছেলেমানুষি কোর না। পাড়ার আভিজাত্য চাও তো সেখানে বাড়ি পাবে, না জমি পাবে? পাড়া বলতে তো এই লাউডন, ক্যামাক, হ্যারিংটন, আলিপুর, না,—কলকাতায় আর ভদ্র পাড়া কোথায়?

ভাস্বতীর বোধহয় হঠাৎ খেয়াল হয় যে অর্জুন তাকে প্রত্যহই দেখে থাকে হোটেলে। রণধাওয়ার সঙ্গে। না, অর্জুনকে চটানো ঠিক নয়।

এখন ভাস্বতী বড় আপিসের জনসংযোগ অফিসারের গলায় বলে, পাড়া যে ছাড়তে চাইছ, ও পাড়া ছাড়লে কাজের লোক পাবে? মা যা বলছেন তাও ভাবো। যথেষ্ট জায়গা নিয়ে বাড়ি করতে হলে তোমাকে সল্ট লেক বা বাইপাসে যেতে হয়।

জজসায়েব বলে যান, ট্রু। ট্রু।

কি বজ্জাত বুড়ো রে বাবা! কোন্‌টা সত্যি? মেয়ের আবদার? গিন্নির খোঁচামারা কথা? না ভাস্বতীর মন রাখা কথা?

ছেড়ে দে মা, কেঁদে বাঁচি। বাড়ি যেতে চাই আমি, গাড়িতে বসে ট্যাবলেট খাব, কবিরাজীও খাব, দুধও খাব, তামাকও খাব। তারপর বাড়ি, বাড়ি, মিষ্টি বাড়ি! কোথা পাব এমন সুন্দর বাড়ি! বাড়ি যাব। ঠাণ্ডা ঘরে

ঠাণ্ডা বিছানায় শোব, বই পড়তে পড়তে…
—কুঙ্কুম! ওসব ভেবে নিজেকে ব্যস্ত কোর না। আমরা সকলেই চাই তুমি চিন্তামুক্ত থাকো, খুশিতে থাকো, আজ চলি!
—আমার খুব ইচ্ছে করছে, একটা দিন বাড়িতে থেকে আসি।
—ছেলেমানুষী কোর না। যাও, লক্ষ্মী মেয়ের মতো ঘুমিয়ে পড়ো!
উঠে পড়েন অর্জুন। ভাস্কর আর ভাস্বতীও বিদায় নিতে থাকে।
জজসায়েব হঠাৎ বলেন, সাবধানে গাড়ি চালিও অর্জুন, আজ বড়ো বিচলিত ছিলে।
—হ্যাঁ, নিশ্চয়।
বিচলিত হব না? যে একখানা বাড়ি তোমাদের, যা সব কথাবার্তা। শ্বশুর বউকে মদ দিচ্ছে, বেটার বউকেও! দেশটা যেন বিদেশ, আর তোমরা সব বিদেশী। অর্জুন চাইলে এখনি তোমাকে আর তোমার ছেলেকে কিনে ফেলতে পারে। বাড়িও কিনতে পারে তোমাদের পাড়ায়। কেনে না, পাঁচজনের চোখ টানতে চায় না। অতি লোভে সঞ্চয়িতা নষ্ট! সে সব কথা মনে না রাখলে চলে?
গাড়িতে বসে ট্যাবলেট ও কবিরাজী খেয়ে ফেলেন। আনন্দ, আনন্দ, হঠাৎ আনন্দে মশগুল হয়ে যান অর্জুন। কি আনন্দ হচ্ছে। কেন হচ্ছে?

৬

বাড়িতে ঢোকেন চাবি খুলে, বন্ধ করেন। প্রথমেই বাথরুমে ছোটেন। ছোটেন না, ভেসে যান। ট্যাবলেটে এমন হচ্ছে, না কবিরাজীতে? বাহাদুর পাজামা, তোয়ালে, গেঞ্জি সব সাজিয়ে রেখে গেছে বাথরুমে। এ বাথরুমে বাথটব থেকে শাওয়ার সব নীল।

নীল তাঁর ঘর, দেয়াল, কার্পেট, পর্দা।

সবুজ ঘরে সব সবুজ। খাওয়ার ঘরে সব কমলা, অতিথিদের জন্যে নির্দিষ্ট গেস্ট রুমে স—ব গোলাপী।

এই গোলাপী ঘরের গোলাপী বাথরুমের দরজা খুলেই যমুনা আসত। যমুনা! যমুনা! ওই গোলাপী নরম গালিচায়, ওইখানে গা ঢেলে ও বিশ্রাম করত। প্রথম দিন তাঁকে বাগিয়ে ঘুসি মেরেছিল বটে, কিন্তু অর্জুনকে কে পারে রোধিতে? মহাবলী সে যে! কবিরাজী ঔষধে পৌরুষ জাগ্রত, সিংহসম মহাতেজে…

ওঃ কবিতা আসছে মনে আপনা হতে, কবিতা! ট্যাবলেটে কি আনন্দ কেষ্টকালী! খেলেও না বুঝলেও না। যমুনাতে স্নান করে কি স্বর্গসুখ, তাও বুঝলে না নীতিবাগীশ কেষ্টকালী কোথাকার! যমুনে, তুমি কি সেই যমুনে? সকালে আমাকে বুড়োশালিক, মড়াখেগো, বদমাশ, কত কি বলেছ? বলো, বলো, তোমার ওপর আমার রাগ নেই।

বাইরে সিকিউরিটি গার্ড আছে। রাত ন-টা থেকে ভোর অব্দি সে

করিডোরে পায়চারি করে।

বাড়ি ঘুরে দেখার কোনো দরকারই নেই। তবু অর্জুনের মনে বেমক্কা সাধ জাগে বার বার।

এমন বাড়ি, এমন সাজানো বাড়ি, ছোট্ট খোকা হামা দিতেপারবে না? ভিজে গায়ে গেঞ্জি ও পাজামা চড়িয়ে অর্জুন বেরিয়ে আসেন। আঃ! মাথায় তারা ফুটছে, তারা জ্বলছে। খোকা রে! খোকাই হোস। মেয়ে-ছেলে হয়ে জন্মাস না বাপ! খোকা হোস।

তোর হামা দেবার জায়গা হবে না? দেখি তো, আমি একটু হামা টানি। আমি হামা টানছি না, ট্যাবলেটে টানাচ্ছে। তবু বড় মজা রে! তোকে আমি চুমো খাব। কিস কিস কুস কুস!

নীল ঘরের নীল গালচে থেকে হামা টানতে থাকেন অ-বাবু! এ যে ময়দান হে! তিনটে ঘরে হামা টানতে তুই হাঁপিয়ে যাবি। সবুজ ঘরের গালচে কত বড়ো, ক—তো বড়ো। টানি, হামা টানি। গোলাপী ঘরে ঢুকি!

অতিথির ঘর। আজ নিজের বাড়িতে নিজে অতিথি হবেন? যদি গোলাপী খাটেই শুয়ে থাকেন? বেশ করবেন। স্বরাজ্যে সম্রাট তিনি।

কিন্তু গোলাপী বিছানা দেখে মনে মন্দ ভাব জাগছে কেন? এ তুমি কি করলে কেষ্টকালী? কি খাওয়ালে, মনে সর্বদা মন্দ ভাব জেগেই আছে?

আর হামা নয়। এবার উঠব, এবার হাঁটব, কিন্তু গোলাপী গালিচার সুদূর কোণে হলদে আঁচল বিছিয়ে কে শুয়ে আছে?

অর্জুনবাবুর রক্তে শত শত তাসা বাজতে থাকে, শত শত তাসা। যমুনা, যমুনা, তুমি এসেছ? আমি তো তোমাকেই চাইছিলাম। মনে মনে টেলিপ্যাথি? আমার মনের খবর তোমার মনে পৌঁছে গেছে বলেই তোমার চাবি দিয়ে বাথরুমের দরজা খুলে ঢুকে পড়েছ?

চালাক মেয়ে, চালাক মেয়ে, জানো যে পাঁচটার পর কেউ থাকে না। মোহিনী নয়, বাহাত্তর নয়, কেউ নয়।

কালই তোমায় কেষ্টকালী মারফৎ নার্সিংহোমে নিয়ে যাব। যাবই, আমি যাবই, ওগো নার্সিংহোম যাবই! শুধু আজকের রাতটার জন্যে, দুষ্টু মেয়ে, মিষ্টি মেয়ে! কিস কিস কুস কুস, তুমি জাগবে না? তোমার চোখ দুটোতে চুমো খেলেও জাগবে না তুমি?

কাছে গিয়ে, চুমো খেতে গিয়ে, মাথার ভেতরে ভূপাল গ্যাস হয়ে যায় অর্জুনের। মস্তিষ্কে কি যেন ফাটে, তারাগুলো উড়ে যায়।

যমুনা মরে গেছে।

—যমুনা! এই যমুনা!

বুকের ভেতর হাত চালান, নাড়ি ধরেন। মুখের কোণে গ্যাঁজা, চোখের কোণে জল।

"না···আ···আ···না"!

অর্জুনবাবু গড়িয়ে পড়েন। হাত এখনো নরম, অথচ যমুনা নেই? জাফরানী পোলাও, তন্দুরি চিকেন, চিংড়ি মাছ, পেঁয়াজের পায়েস, সবাই বিদ্রোহ করে।

বাথরুম! বাথরুম! হড়হড়িয়ে বমি হয়ে যায় সব। বমি ধুতে হবে। শাওয়ার খুলে মাথা ঠাণ্ডা করেন অর্জুন। তারপর ভাবতে থাকেন।

হায়! এ তো তাঁর জানার কথা নয়, যে যমুনা খোঁড়া ডাক্তারের কাছেই গিয়েছিল। গাঁজা, চরস, কোকেন, কত কিছুর ঘোরে খোঁড়া ডাক্তার ওকে কি দিতে কি দিয়েছিল।

উনি তো জানেন না যে যমুনা চাবি নাচিয়ে জনি ও তালাকে বলেছে, ওষুধ খেয়ে ওখানেই শুয়ে থাকি রে। মোহিনী, বাহাদুর, সব চেনাজানা, বাড়িও ফাঁকা। অমন আরাম কোথায় পাব?

ওষুধে কাজ হলে ঘনঘন বাথরুম, সেও ওখানেই সুবিধে।

উনি তো জানেন না, ওষুধ খাবার পরেই যমুনা কি ভাবে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে, মাটিতে এলে পড়ে, বুকে তার তীব্র যন্ত্রণা হয়, অথচ গলা হয়ে যায় নির্বাক।

অর্জুনবাবু মাথা ঠাণ্ডা করে বেরিয়ে আসেন। রাত এখন, অনেক রাত।
পুলিশকে খবর দেবেন ?
না, পুলিশ নয়।
সিকিউরিটি গার্ডকে ডাকবেন ?
না, দ্বিতীয় ব্যক্তি নয়। কাউকে জানানো চলবে না। যাকে জানাবে সেই তোমায় ব্ল্যাকমেইল করবে।
ঠিকাদারি বাগাবার গোপন রহস্যই কি তিনি জানাতে যান ? যে জানে সে জানে।
বই পড়ে পড়ে অর্জুনবাবু অনেক কথা জেনেছেন। যে-সব বই পড়ে জেনেছেন, সেগুলো থাকে তাঁর শোবার ঘরে। শোবার ঘরে ঢোকো, জন ম্যাকডোনাল্ড, জেম্‌স হেডলি চেজ, লরেন্‌স স্যান্ডার্স, এড ম্যাক-বেইন এ রকম কত লেখকের পেপারব্যাক সাজানো আছে।
বসার ঘরের লাইব্রেরি এক ইনটেরিয়ার ডেকোরেটর ফার্ম সাজিয়ে দিয়ে গেছে। চটজলদি বড়লোকদের ঘরে বই ওরাই সাজায়।
জাংক প্রথায়।
বিষয়সূচী বেছে বই সাজানো নয়। এর ঘাড়ে ওকে চাপিয়ে সাজানো। কোনো বই বেঁকিয়ে রাখা, কোনো তাক আধা খালি।
যাতে দেখলেই মনে হয় যে এ লোক বই পড়ে। এর বই গৃহসজ্জা নয়।
কি নেই সেখানে ?
মনস্তত্ত্ব—উপন্যাস—অ্যাবসার্ড নাটক—সমুদ্রবিজ্ঞান—ছোটগল্প—মহাকাশ গবেষণা—আন্তর্জাতিক বিপ্লবীদের জীবনী—পাখি চেনা—কৃষ্ণাঙ্গ বিদ্রোহী সাহিত্য—শিকার সাহিত্য—তৃতীয় বিশ্ব বিপ্লব বিদ্রোহের ইতিহাস—কবিতা—ভ্রমণ—কি চাও ?
সে সব বই তো বলে দেবে না যমুনা কি ভাবে মরল ?
হত্যা ?
আত্মহত্যা ?

দুর্ঘটনা ?

না, কোনো বইয়ে হদিশ নেই।

পশ্চিমবঙ্গ একটা যাচ্ছেতাই জায়গা। অপরাধ অন্তহীন, কিন্তু সে কথা লেখার একটা লোক নেই? তবে কি টমসনের সেই বইটার নায়কের সে কথাই সত্যি, যে সব মানুষই মনে মনে খুনী হবার ক্ষমতা রাখে, সবাই পারে না।

যাক গে, তাদের কথা ভেবে লাভ নেই। তিনি নিজেই এখন গভীর বিপন্ন।

হায়! নিজেকে নিরাপদ, সুরক্ষিত রাখা কত কঠিন। কত অসম্ভব।

তাঁর অবস্থা কি ?

এ বাড়িতে অন্যান্য ঘরেও কাজ করে যমুনা, তাঁর ঘরেও কাজ করে। এ বাড়িতেই ও বেশিক্ষণ থাকে, বেশি সময়।

কুঙ্কুমও বাপের বাড়ি গেল, ওঁর সঙ্গেও যমুনার···যমুনার সঙ্গে ওঁর···

মোহিনী জানে, বাহাদুরও জানে।

গার্ডটা তো জানেই।

ওদেরকে মানুষ মনে করেন নি অর্জুন, ভয় পান নি, লজ্জা করেন নি। এখন ওদের কথাই ভাবতে হচ্ছে।

থানায় যাবেন না। কেন যাবেন। যদি উনিই ওকে খুন করতেন, তাহলে থানায় যেতেন, টাকা ঢালতেন, খবরটা ঘুরিয়ে দেওয়া যেত। বর্ণমালায় তেমন ঘটনা আগেও ঘটেছে।

কেন যাবেন ?

উনি তো অনেক টাকা ঢেলে নার্সিংহোমে নিয়ে গিয়ে ওকে ভারমুক্ত করতে চেয়েছিলেন।

যমুনারা অর্জুনবাবুদের বিশ্বাস করে না কেন? উনি ওর গর্ভের জন্য দায়ী, মৃত্যুর জন্য দায়ী নন, এ কথা কাকে বোঝাবেন ?

কি দুঃসময়, কি দুঃসময়!

কুঙ্কুম পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে আটমাস গর্ভ নিয়ে বিবাহবার্ষিকীর বায়না ধরেছে।

সবসময়ে বলো, "তোমার কালচার নেই।" এখন যা করতে চাইছ সেটা কোন্ সুরুচি? ফিবছর স্টেটসম্যানে তো দেখতে পাও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন। তাতে হচ্ছে না? যত সব ন্যাকামি। কাগজে ছেপে আনন্দ জানানো।

দুঃসময়, বড় দুঃসময়।

প্রস্তাবিত কনকা সেতুর জন্যে পায়ে তেল দিয়েছেন, টেণ্ডার হয়ে যাবেই যাবে, এমন সময়ে এ কি করল যমুনা?

এ কথা কানাকানি হলে সর্বনাশ।

যে পায়ে তেল দিয়েছেন, সে তো কুঙ্কুমের এক মামার পা। কি দৃপ্ত ঘোষণা তাঁর।

—আত্মীয় পাইলে আর কেরেও দিব না। আমার কথা ঐক্যবন্ধন।

সব কেঁচে যাবে। সাজানো বাগান শুকিয়ে গেল গো। সাজানো বাগান।

বাঁচতে হলে নাচতে হবে।

বাঁচার পথ একটাই।

ওঁর ঘর থেকে যমুনাকে পাচার করা দরকার। খুব তাড়াতাড়ি। কোথায় কোথায় কাজ করত যমুনা? কোন্ কোন্ ঘরে?

হঠাৎ বিজলী খেলে যায় মাথায়। দেখা না দেখায় মেশা বিদ্যুৎলতা এমন রাতে অর্জুনবাবুর মাথাকে চমকে দেয়, আলো ফেলে।

আরে! যমুনা তো ইলা দেশাইয়ের ঘরেও কাজ করত। তাঁর এ বাথ-রুমের দরজা, ওঁদের গেস্টরুমের বাথরুমের দরজা তো মুখোমুখি।

সেই যে একবার চাবি হারিয়ে তিনি আর কুঙ্কুম বোকা বনেছিলেন, ওঃ, সে কি বিপদ! তারপরেই খুব বন্ধু এক পুলিশ কর্তা বলেন, এটা একটা বিপদ হ'ল?

—বিপদ নয়?

—আরে, আবদুল হ'ল "চাবি বানানোর ডকটরেট"। ওকে দিয়ে বানিয়ে

দিচ্ছি।

—ও কি জেলে আছে ?

—তাতে তোমার দরকার কি ?

এক গোছা মাস্টার চাবি করিয়ে, সেটি এক বিবাহবার্ষিকী না জন্মদিনে উপহার দিয়ে বন্ধু বলেছিলেন, দেখো, চোর ডাকাত হয়ে যেও না যেন।

রাত হোক, একটা বাজুক। ইলা দেশাইয়ের মাথা খারাপ। দেশাই সায়েব সারাদিন ওঁকে সামলান, রাতে ঘুমের ওষুধ খেয়ে দুজনেই···

যাক, পথ মিলল একটা।

ক্ষিদে ক্ষিদে পাচ্ছে কেন ?

সব বমি হয়ে গেছে বলে ?

ক্ষিদে পাচ্ছে না মনে মন্দ ভাব জাগছে ? সবই তো আসলে ক্ষিদে। ক্ষুধার্ত জগতে কত রকম ক্ষিদে না থাকে।

অর্জুনবাবু খাবার ঘরে এসে ফ্রিজ খোলেন। রুটি, মাখন, চীজ, তাই সই।

গবগবিয়ে খান উনি। ঢকঢকিয়ে জল খান। দেহে বল চাই, সামর্থ্য চাই। এখন কাজ যে অনেক, অনেক। এখন দুর্বল হলে চলবে না।

খেয়েদেয়ে বলশালী অর্জুনবাবু প্রতি ঘরের আলো নেভান। জ্বলতে থাকে শুধু নো-পাওয়ার রঙিন আলোগুলি। প্রত্যেকটা ঘরকে ভূতুড়ে দেখায় এখন।

এবারে কাজ। মাস্টার চাবি বের করো বইয়ের তাকের পেছনের লকার থেকে। আস্তে আস্তে খোলো গোলাপী ঘরের বাথরুম। দেখে নাও চারদিক। হ্যাঁ সবই চুপচাপ, শান্ত, নিঃশব্দ।

জমাদাররা ছাড়া কে আর ঢোকে এ দিক দিয়ে, কার দায় পড়েছে।

এবারে পা টিপে টিপে সাত নম্বরের বাথরুমের দরজা খোলেন।

এবারে ঝপাঝপ কাজ সারো।

কিন্তু যমুনাকে ছুঁতেও তো ভয় করছে, পারছে না যেন। মুখের কোণে

গ্যাঁজা না কষ, মুছে দেন জোর করে ওর আঁচল দিয়েই। সেই হলদে শাড়ি গো!

চোখের কোণে জল, চোখের কোণে জল! আহা, কত না কেঁদেছে, কত না কষ্ট পেয়েছে মেয়েটা! কেন চোখের জলে ভিজিয়ে দিলেম না···মন! শান্ত হও। জীবনের চরমতম সংকটে গান মনে পড়ে যায়, উদ্ধার নাই তার।

মন! তুমি তো স্বাধীন জেনানা নও। অর্জুনবাবুর দেহে তোমার বসবাস। তোমাকে এখন বুঝতে হবে—

অর্জুনবাবু খুন করেন নি, কিন্তু খুনের দায়ে পড়তে পারেন যখন তখন। যদি জানাজানি হয়?

কেচ্ছা, কেলেংকারি, রটনা!

বর্ণমালা বাড়ির প্রতিটি ঘর থেকে আনন্দের উল্লাস শোনা যাবে। সেদিনই লালোয়ানি বলছিল, অর্জুনবাবু! টিপিকাল বেংগলীবাবু! ডুবে ডুবে জল খাও না তো? বাইরে যারা ম্যাদামারা, ভেতরে তারাই···

যমুনাকে তুলতে জীবন বেরিয়ে যায়। মৃতের ভার এত বেশি? জীবিত যমুনা তো তরঙ্গ-বিহঙ্গ-কুরঙ্গ—এ সবের মতোই ছিল। আঃ, আবার বড় বড় বাংলা শব্দ মাথায় আসে?

পাঁজাকোলা করে ওকে তোলেন। ওর মুখ থেকে বিষের ঝাঁঝালো গন্ধ ওঁর নাকে আসে। কি খেল, কি খেয়ে মরল? আত্মহত্যা করল? না, কোনো হাতুড়ের কাছ থেকে ভূতুড়ে ওষুধ খেয়ে মরে গেল?

পা টিপে টিপে, পা টিপে টিপে ছোট্ট করিডোর পেরিয়ে শুকনো অব্যবহৃত বাথটবে ওকে শুইয়ে দেন। দেশাই, দেশাই, তোমার সঙ্গে আমার কোনো বিবাদ নেই। তোমার স্ত্রী পাগলিনী, মেয়েজামাই মারা গেছে, ছেলে থাকে বম্বে—তোমার ওপর দিয়ে বড় নির্যাতন চলে।

তার ওপর যমুনার মৃতদেহের ভার চাপালাম। ক্ষমা কোর। বিপদকালে চাচা, আপন বাঁচা।

দেশাইদের বাথরুমের দরজা বন্ধ করেন। এ বাড়ির সার্ভিস অন্যরকম। দেশাই নিজে প্রতি তালা, ল্যাচ, স্প্রিং, কবজায় তেল দেন। আগে তো বাড়ি রং করাতেন ঘন ঘন।

এবার নিজের বাড়ি ঢোকো অর্জুন, দরজা বন্ধ করো। বড় দেরিতে মনে পড়ে যে দেশাইয়ের বাড়ির বাথরুমের দরজায় রয়ে গেল ওঁর আঙুলের ছাপ। মোছা হ'ল না।

ইস। এমন ভুল ডিক লেব্রিজের বইয়ের খুনীরা কখনো করে না। খুন করলেই তারা আঙুলের ছাপ মোছে।

যাক গে, তাদের কথা আলাদা। তারা খুনী। অর্জুনবাবু কিছু মণ্টেকার্লো বা মার্সাই বা মেক্সিকো বা শিকাগোতে থাকেন না এবং ডিক লেব্রিজের খুনেদের মতো তারের ফাঁস দিয়ে বা নাইলনের মোজা দিয়ে বা পর্দার দড়ি দিয়ে গলা পেঁচিয়ে মারেন না। হাতের ছাপ মোছার বুদ্ধি তাঁর থাকতে পারে না।

দরজা বন্ধ। অর্জুনবাবু আলো জ্বালেন। যমুনা কোথায় বসেছে, কি করেছে, কেমন করে জানবেন? কোন্ কোন্ চিহ্ন মুছবেন? মুখের কস গড়িয়ে গোলাপী কার্পেটে পড়েছে। কার্পেটের দাগ মোছা কি সহজ? কেমন করে মোছে তাও জানেন না।

টুং টাং টুং টাং।

বেল বাজছে।

হৃৎপিণ্ড পোলভলট খেয়ে আছড়ে পড়ে। এত রাতে কে বেল বাজায়? যমুনার মস্তান ভাইরা? ওর সেই স্বামী? তারা ওপরে উঠবে কি করে? দরজার কাঁচে চোখ রাখেন।

সিকিউরিটি গার্ডের মুখ।

দরজা খোলেন।

—এত রাতে কি দরকার?

—আলো জ্বলতে দেখলাম, নিভতে দেখলাম। আপনি তো অনেকক্ষণ

এসেছেন···ভাবলাম অন্য কেউ ঢুকল না কি ?

—অন্য কেউ ?

—কোনো চোর বদমাশ···

না, চোর বদমাস নয়। ঢুকেছিল যমুনা। মরতে এসেছিল। সে কথা তুমি জানো না।

—আমি, আমি, কেউ নয়।

—ঠিক আছে। সালাম সাব।

—ঠিক আছে।

আবার দরজা বন্ধ করেন। জ্বলুক, আলো জ্বলুক গোলাপী ঘরে। না না, নেভাতে হবে। ঘুমোতে হবে কামপোজ খেয়ে। সকালে যেন সবাই ওঁকে দেখে স্বাভাবিক, সহজ।

গার্ড ! তুমি কি পাহারাই না দিচ্ছ! এদিকে আমার ঘরে জেম্‌স হেডলি চেজ হয়ে গেল। কিছুই জানলে না।

যমুনার কথা মনে আসে।

—লপটে টাকা রাখো !

হায় যমুনা ! একবার সন্তান সম্ভাবনাতে তুমি নিকেশ হয়ে গেলে। টাকা বাড়িতে দু'তিন দিন থাকে। তারপর চলে যায় বেনাম অ্যাকাউণ্টে, নানা রকম স্কীমে, টাকা আরো টাকার ডিম ও বাচ্চা পাড়ে। টাকার ক্ষেত্রে, টাকা বাড়াবার ক্ষেত্রে পরিবার পরিকল্পনা চলে না, চলতে পারে না।

তাহলে কলকাতায় বাড়ি-জমি, সব কিছুর এত দাম বাড়বে কেন ? এ সব টাকা কৃষ্ণাঙ্গ, এদের গায়ে হাত পড়লে প্রতিবাদ আসবেই।

মড়া ধরেছেন বলে কি স্নান করবেন ?

কুঙ্কুমের পুজো পাঠ নেই যে হাতে গায়ে মাথায় গঙ্গাজল ছেটাবেন। বাথরুমে গিয়ে সব ছেড়ে ফেলে সিলকের লুঙ্গি পরেন। হাত-পা-মুখ ধোন-বার বার। এবার কামপোজ খেয়ে ঘুমের সাধনা করতে হবে।

সাদা ও নরম বিছানা আর কণ্টকশয্যা।
চোখের পাতায় যমুনা।
কার্পেটে বিছিয়ে থাকা যমুনা।
বাথটবে যমুনা।
সর্বত্র যমুনা, যমুনা, যমুনা।

৭

বাথটবে যমুনা।

ভোর সবে হচ্ছে। দেশাই ঠোঁট কামড়ে চেয়ে থাকেন।

বম্বে থেকে ওঁর প্লেন ছাড়ল দেরিতে, পৌঁছল মাঝরাতে। বিমান বন্দরেই রাত কাটালেন। ভোর না হতে ট্যাক্সি ধরে ফিরলেন। ইলাকে একা রেখে গেছেন, প্রচণ্ড চিন্তা ছিল।

সামনের দরজার বেল বাজান নি। পেছনের দরজা দিয়ে ঢুকেছেন। বরাবরই তাই করেন। ওষুধ খেয়ে ইলা বেলা অবধি ঘুমোয়। ওর ঘুমটা দেশাইয়ের কাছে খুবই দামী।

ইলা মানসিক ভারসাম্য হারিয়েছে দীর্ঘদিন। এখন যত ঘুমোয় তত ভালো।

ইলা, ইলা, সব সময়ে বলতে, ওই কুত্তীটা যেন আমার ঘরে না ঢোকে। ওকে আমি মেরে ফেলব।

"মেরে ফেলব" বলা এক কথা, মেরে ফেললে শেষ অবধি? একথা জানাজানি হলে? তোমাকে যে ক্রিমিনাল লুনেটিকদের সঙ্গে রেখে দেবে। সে যে নরক, নরক ইলা?

তোমাকে বাঁচিয়ে চলি আমি। ছেলের সঙ্গে কথা বলতে সকালে বোম্বাই যাই, রাতে ফিরি।

—ওকে আমি মেরে ফেলব।

—ও সুচেতনার কাপড় পরেছে কেন ?

—ও জলে বিষ মেশায়।

—আমিও ওকে শেষ করব।

যমুনা, যমুনা! কতদিন বলেছি মেমসায়েবকে "পাগলীমেম" বোল না।

কেমন করে কাকে বোঝাবেন দেশাই ?

যমুনাকে রাখতে ওঁর ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু ইলা পাগল, ইলা বলেন, মেরে ফেলব—কেউ তো কাজ করতেই চাইত না।

যমুনা রাজী হয়েছিল।

একশো টাকা মাইনে নিত, শীতের চাদর, পুজোর কাপড়, কিন্তু কাজে কামাই ছিল না।

রান্নার লোক নেই, চাকর নেই, হোটেল থেকে খাবার আসে, ইলা সম্পূর্ণ পাগল। যমুনা ছিল বলে পরিষ্কার থেকেছে ঘর, বাসন মাজা, কাপড় কাচা, মেশিনে জলের বোতলে জল ভরা, সব কাজ হয়েছে।

সেই যমুনাকে ইলা এ কি করল ? কেমন করে করল ?

বাথরুমের দরজা বন্ধ করেন দেশাই। বাথরুম থেকে বেরিয়ে যে ঘর, সে ঘরের তালাও বন্ধ করেন। বন্ধ করতে যেতেই সুচেতনার হাসি মুখের দিকে চোখ পড়ে।

বধূ সজ্জায় সুচেতনা মুখে হাসি মেখে চেয়ে আছে। সকলের বয়স বাড়বে, ওর বয়স কোনোদিন বাড়বে না। ও চিরদিন থাকবে বাইশ বছরের, হাস্য-মুখী, বিয়ের সাজে ঝলমলে।

দেশাই দরজা বন্ধ করেন। তালা আঁটেন। বিয়ের এক বছরের মধ্যেই মেয়ে জামাই বিমান দুর্ঘটনায় মারা যাবে কে ভেবেছিল!

ভগবান যাকে দেন, ঢেলে দেন।

দেশাইকে দিয়েছেন, ঢেলেই দিয়েছেন। একমাত্র মেয়ে আর জামাই সেই। জামাই আবার তার মা-বাপের একমাত্র সন্তান ছিল।

স্ত্রী মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে এখন পাগল।

আর একমাত্র ছেলে, ডাক্তার ছেলে, বম্বেতে থাকে। সে আসতে সময় পায় না। দেশাইকেই দৌড়ে যেতে হয় ইলার কথা বলার জন্যে।

ক্রমে ক্রমে ইলা মন্দের দিকেই যাচ্ছে। ছেলেকে বোঝানো অসম্ভব। যদিও, ছেলের সঙ্গে যোগাযোগ করেই ডাক্তার দেশপাণ্ডেকে দিয়ে কয়েকবার চিকিৎসা করিয়েছেন বোম্বেতে। ইলাকে ওই ডাক্তারের নার্সিংহোমেও রেখেছেন কয়েকবার।

ইদানিং ইলা বড্ড বেশি বলছে, "খুন করব"—বড্ড হিংস্র চোখে তাকাচ্ছে চারদিকে। কেন যেন ওর মাথায় ঢুকেছে যে যমুনা ওঁর মেয়ে সুচেতনার জামাকাপড় পরে বেড়ায়।

সুচেতনা মারা গেছে সাতবছর আগে। তার কোনো জামাকাপড় এ বাড়িতে নেই, সে যমুনাকে চোখেও দেখে নি।

বোঝাবে কে?

তাঁকেও তো বলে, খুব করব।

তাঁর মনে হয়, তাই করো ইলা। আমাকে তুমি যদি মেরে ফেলো, তার পর তোমার কি হবে সে চিন্তা আমার থাকবে না।

এবার ছেলেকে সে কথা বলতেই গিয়েছিলেন যে, তোমার মাকে পাকা-পাকি রকম কোনো জায়গায় রাখা দরকার। বোম্বেতেই করতে হবে।

—কেন, উন্নতি হচ্ছে না?

—কোনো উন্নতি হচ্ছে না।

—কি রকম সব লক্ষণ?

—কি করে বোঝাব?

—সব সময়ে বকে? যেমন বকত?

—নিজের মনে বকে যেত, সে ছিল এক রকম। এখন, এবারকার কথাই ধরো। এখানে আনলাম, থাকল নার্সিংহোমে, একটু ভালও তো হ'ল, সেজন্যে নিয়ে গেলাম···

—তারপর?

যখন মনে হ'ল খানিকটা ভালো, তখন দেখি যে ও বলে যাচ্ছে, "মেরে ফেলব", "খুন করব।" কিন্তু ধূর্ততা এমন যে, অন্যদিকে চেয়ে নিচু গলায় বলে যায় কথাগুলো।

—কোনো বিশেষ লোকের ওপর আক্রোশ?

—বিশেষ লোক মানে?

—কাজের লোকজন?

—গরম কেটলি ছুঁড়ে রান্নার লোককে মারল, কত টাকা দিয়ে সে ব্যাপার মেটাতে হ'ল। তারপর থেকে কোনো লোকজন, এমন কি জমাদারও কাজ করতে চায় না। কোনো লোক থাকে না।

—বাবা! চালাচ্ছ কি করে?

—একটা মেয়ে ঠিকে কাজ করে, আমি রাতদিন নজর রাখি, হোটেল থেকে খাবার আসে।

—খুব কষ্ট।

—কষ্ট নয়? আমারও তো বয়স পঁয়ষট্টি হ'ল। এ বয়সে সকালে আসব, রাতে ফিরব, সর্বদা ওর জন্যে চিন্তা করে করে···

—হ্যাঁ। কি যে করা যায়!

—এবার কোথাও পাকাপাকি রেখে দিতে হবে ওকে। সে ব্যবস্থাটা করো, ফোনে জানাও। যেই জানাবে, অমনি ওকে নিয়ে আসব।

—এখান থেকে যখন গেল তখন তো এতটা খারাপ ছিল না।

—মানসিক রোগীর একটা ধূর্ততাও জন্মায়। তোমাকে বুঝতেই দেবে না কি ভাবছে। তুমি বলছ ভালো! দমদমে নেমেই আমাকে লাথি মেরে ফেলে দেয়, জানাই নি, কত আর জানাব?

—সত্যি, মা যে এ রকম হয়ে যাবে···

—তুমি দেশপাণ্ডেকে বলো।

—পাকাপাকি কি রাখবে?

—কেন রাখবে না? আলাদা ঘরে, যত্ন যাতে পায়, আমি ডোনেশন

দেব, মোটা ডোনেশন, কি জন্যে টাকা বাঁচাব?
—টাকা অনেক চাইবে বাবা।
—আমিও দেব। কলকাতার বাড়ি বেচে দিলে আজ পনেরো লাখ তো পাবই। আগাম নিয়ে ডোনেশন দেব?
—না না, তা করতে হবে না। তুমি যে ডোনেশান দেবে তা দেশপাণ্ডে জানে।
—কথা বলো। খুব জরুরি। নইলে…
—ইলার যা আক্রোশ কাজের মেয়েটার ওপর…যে কোনো সময়ে… তুমি বা আমি তো কেচ্ছা চাই না। তেমন হতেই পারে।
—না না, আমি বলছি!
হ্যাঁ, ভয় পেয়েছে ছেলে। মা অমন কোনো কাজ করলে সে কেচ্ছার দাগ ওর জীবনেও লাগবে।
—সুচেতনার নাম আজও বলে না?
—না। তবে ইদানিং মাথায় ঢুকেছে কাজের মেয়েটা সুচেতনার কাপড় চুরি করে পরে।
—আশ্চর্য, তখন পাগল হ'ল না!
প্লেনে ফিরতে ফিরতে দেশাই সে সব কথাই ভেবেছেন। একমাত্র মেয়ে গেল, জামাই গেল, তখনকার মতো কান্নাকাটি, গুমরে থাকা, এ তো স্বাভাবিক।
তারপর ইলা কেমন আস্তে আস্তে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে এল। আবার যেত বনসাই ক্লাবে, প্রতিবন্ধী শিশুদের কল্যাণ সংঘে, "গাছ লাগান, শহর বাঁচান" ক্লাবে।
আজ কয়েক বছর ও সব ছেড়ে দিয়েছে। ধীরে ধীরে হারিয়েছে মানসিক ভারসাম্য।
মেয়ের নাম করে না, ছবি দেখে না, ছেলের কাছে আসে বম্বেতে, ছেলের সঙ্গে কথা বলে না। ছেলে এমন গাধা যে বাপকে বলে, মা অন্যরকম।

কখনো ভায়োলেণ্ট হবে না।

হবে কি হবে না এখন তুই এসে দেখে যা। তোর ষাট বছরের মা একটা বাইশ চব্বিশ বছরের জোয়ান মেয়েকে খুন করে বাথটবে শুইয়ে রেখেছে কি না।

দেশাই যন্ত্রচালিতের মতো নিজের বাথরুমে যান, স্নান করেন। বেরিয়ে এসে কফি তৈরি করেন, খান।

তারপর ইলার কাছে গিয়ে দাঁড়ান।

ঘুমোচ্ছে, অকাতরে ঘুমোচ্ছে। এখন ওকে দেখলে কেউ বলবে, যে ও এমন ভয়ংকর কাজ করতে পারে? দেখলে মনে হবে জীবনের জটিলতায় ভাসতে ভাসতে অবশেষে তীরে উঠে ঘুমিয়ে পড়েছে।

দেশাই মাথার রগ দু'হাতে ধরে বসে থাকেন। এ ঘরে শ্মশানের শূন্যতা। তাঁর জীবন তো শ্মশানই।

দেশাই শেয়ার মার্কেট স্পেকুলেটিং করে করে অনেক টাকা করেছিলেন। তবু এ বাড়িটা কেনা কি ঠিক হয়েছিল? গ্রেবাল তাঁকে বিক্রি করেছিল। গ্রেবালের বাড়ি থেকে ড্রাইভার কি সব চোরাই টাকা চুরি করে পালাল। গ্রেবাল অনেক চেষ্টায় অনেক টাকা ঢেলে পুলিশের মুখ বন্ধ করল। তার পর ওঁকে ফ্ল্যাট বেচে দিয়ে চলে গেল দিল্লী।

বাড়ি সাজিয়েছিলেন মনের মতো করে। ইলাও তো ওর বাবার বিখ্যাত সেই শার্টিং স্যুটিং কারবারের শেয়ার পেত। সাজিয়ে নিতে কোনো কষ্ট হয় নি।

একটি ঘরে পেতলের দোলনাও টাঙিয়েছিলেন। গুজরাটে যেমন দেখা যায়। বড় সাধ ছিল, দুজনে পাশাপাশি বসে দোল খাবেন।

তিনি সায়েব, ইলা মেমসায়েব, ছেলে ডবল সায়েব, সুচেতনা ছিল ভারতীয়। তবু কাথিয়াওয়াড়ের মানুষ তিনি, দোলনাটা তার স্মৃতি চিহ্ন থাকুক। দেশাইয়ের বাবা-মা বছর কয়েক কথা বন্ধ রেখেছিলেন। কিন্তু বিরসবদনে দুজনে পাশাপাশি বসে দুলতেন।

এ ঘরে গালার কাজ করা খাট, টেবিল, চেয়ার। কাচের কাজ করা বেডকভার।

গুজরাটের কথা মনে করা যায় এ ঘরে ঢুকলে। ইলা যতদিন স্বাভাবিক ছিল, তুজনে কত তুলেছেন কথা বলতে বলতে।

এবাড়িটা কেনার পর থেকে কি কি তুর্ঘটনা হ'ল ?

ছেলের মোটর অ্যাকসিডেন্ট—

সুচেতনা আর জামাইয়ের মৃত্যু—

ওঁর নিজের পা ভেঙেছিল—

ইলা, ইলা, ইলা!

না না, বাড়ির জন্যে এ সব হয় নি। যা হবার তা অন্য কারণে হয়েছে। ছেলের ব্রেক ফেল করে। সুচেতনাদের প্লেন ছাড়ার আগে চেক করা হয় নি। ওঁর পা ভাঙে আছাড় খেয়ে। ইলা হয়তো সুচেতনার মৃত্যুর পর অত্যধিক শক্ত থাকতে গিয়ে ভেতরে ভেতরে ভেঙে যায়।

পুলিশকে বলবেন ?

না, না, না।

পুলিশকে বললেও টাকা খাওয়াতে হবে। মেয়েটার কে আছে, টাকা ঢালতে হবে। কাগজে·কাগজে বেরোবে রসালো রিপোর্ট, আর ইলাকে ওরা পাঠাবে কোনো জায়গায়, যা নরকতুল্য।

"বর্ণমালা" যত ঝকঝকে হোক না কেন, তুয়ার হতে অদূরে তো খিদির-পুরের সেই সব এলাকা, তা কি মনে রাখতে হবে না ?

এখানকার বস্তিগুলো সমাজবিরোধীদের ডেরা। খুনজখম এখানে ডাল ভাত। চোরা কারবারীদের রমরমা এখানে। এখানে বিনোদ মেহতা খুন হয়। ফ্যানসি বাজার সংখ্যায় বাড়ে, এ অন্য কলকাতা।

যমুনা কোনো বস্তি থেকেই আসত। সেখানকার লোকরা জানলে ওঁকে ছেড়ে দেবে ?

কলকাতার মেজাজ যে অন্যরকম।

বস্তিতে ওরা নিজেরা মারামারি করে।
কিন্তু গাড়ি-বাড়ি আছে, ইংরিজি বলে, এমন কোনো লোক যদি ওদের গায়ে হাত দেয়?
ওরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে ঝাঁপ দেবে।
ওদেরকে বোঝানোই যাবে না যে হত্যাকারী একজন উন্মাদ স্ত্রীলোক।
সবাই বলবে, ও রকম পাগলকে কেউ ঘরে রাখে?
কাকে বোঝাবেন যে ইলা কি চমৎকার স্ত্রী, কি স্নেহময়ী মা ছিল। ওর কথাবার্তা, সামাজিক ব্যবহার কত স্নুন্দর ছিল।
এ বাড়ির কারো সঙ্গে তো ওঁরও কোনো সম্পর্ক নেই আর।
ইলার জন্যে সব বন্ধ।
অর্জুনবাবুর কাছে যাবেন? একমাত্র ওর বউয়ের কাছ থেকে ইলা মাঝে মাঝে বই আনে। পড়ে না, পড়তে পারে না। বউও তো নেই।
অর্জুনবাবুই বা কি করবেন?
আজকাল কেউ কারো ঝামেলায় যেতে চায় না। যাওয়া অসম্ভব। খুনের ব্যাপারে সাহায্য পাবেন এমন কোনো লোককে উনি জানেন না।
দরকার নেই, দরকার নেই। ইলা যা করেছে তা সজ্ঞানে করে নি। তাকে সেজন্যে বাঘের মুখে তুলে দেওয়া যায় না। ইলাকে বাঁচাতে হবে।
হঠাৎ দেশাই বোঝেন ইলা জেগেছে।
—হাই ইলা!
—হাই ধীরু।
—উঠবে না।
—আজ আমি আর তুমি না কাশ্মীর যাব? জামাকাপড় কোথায়? স্যুটকেস কোথায়?
—সব হবে।
—জামাকাপড়···নিশ্চয় চুরি করেছে।
—কে?

—ওই কুত্তীটা। যমুনা!
—ইলা, তুমি ওকে কিছু করেছ?
—করি নি, তবে খুন করব।
—ওকে কিছু খেতে দিয়েছিলে?
অসম্ভব ধূর্ত হাসেন ইলা।
—ওকে দেব কেন? আমরা একসঙ্গে ডিনার খেলাম, মদ খেলাম, কি মদ খায়!
—মদ পেলে কোথায়?
—ও তো রোজ আনে, আমরা খাই।
—মদে কিছু দিয়েছিলে?
—বলব কেন? তোমাকে বলব কেন? সুচেতনার সব শাড়ি চুরি করেছে, আমার সব গয়না—আমি ওকে নখে পিষে মারব।
ইলা উঠে বসেন। দূরে বসে দেশাই ওঁকে দেখতে থাকেন। চুল কাঁচা পাকা। মাথার দোষ হয়ে থেকে শর্টস আর গেঞ্জি পরেন। হাত দুটো বেশি লম্বা, কাঁধ চওড়া, হাড় খুব চওড়া।
ওই দু হাতে যমুনাকে তুলে নিয়ে বাথটবে শোয়ানো খুবই সম্ভব। পাগলদের গায়ে জোরও হয় খুব।
কিন্তু কোন্ ঘর থেকে ওখানে নিল?
—কোন্ ঘরে খেলে তোমরা?
—খাবার ঘরে। বাথরুমে খাব?
—কি কি খেলে?
—মনেই নেই।
—তোমার ওষুধ খেয়েছিলে?
—ও সব ওষুধ নো গুড। মেয়েটা আমাকে খাস ডকের মাল এনে দেয়।
—কি সে জিনিস, আমায় বলবে না?
—না। তুমি তাহলে আমাকে মারবে।

—কোনোদিন তোমার গায়ে হাত দিয়েছি?

—বা, রোজই তো মারো।

—আজ কখন মেরেছি?

—কাল রাতে মারছিলে।

—রাতে তো আমি দমদমে।

—মিথ্যে কথা।

—যমুনা কখন এল, ইলা?

—বলব না, বলব না।

—কেন বলবে না?

—কফি করো, টোস্ট বানাও।

—করছি ইলা, করছি।

কি দিতে পারে ওকে ইলা? কোথায় পেল? ইলা! যদি ওকে না দিতে? যদি নিজে খেতে? দেশাই শুনেছেন ওঁদের নাইটগার্ডের ছেলেটা ডক এলাকা থেকে মাল এনে ঘরে ঘরে পৌঁছে দেয়। তার কাছ থেকে কিছু নিয়েছিল?

এসব ভেবে লাভ নেই। ইলা ওকে কি ভাবে মারতে পারে, তা ভাবতে পারছেন না দেশাই। সোজা কথা হ'ল, ইলা উন্মাদ, যমুনার ওপর ওঁর আক্রোশ ছিলই। কাল চব্বিশ ঘণ্টা মতো ইলা একলা ছিলেন, যদিও জলে, থার্মোসের কমলালেবুর রসে যথেষ্ট ঘুমপাড়ানি ওষুধ ছিল। এটা তো করতেই হয়। নইলে দেশাই বেরোবেন কি করে?

ইলা একলা ছিলেন।

যমুনা বাথটবে।

যদিও ইলা এখন যা বলছেন, তার কোনো মানে ধরা যাচ্ছে না।

—কফি খাও ইলা, টোস্ট নাও।

—দাও।

টোস্ট, কফি, সব খেয়ে হঠাৎ ইলা চেঁচিয়ে ওঠেন, এত তেতো কেন, কি

দিয়েছ তুমি আমাকে ? কি খাওয়ালে ? কেন বিষ দিচ্ছ ?

—ইলা !

—ষড়যন্ত্র ! ষড়যন্ত্র ! বাঁচাও ! বাঁচাও !

দেশাই ওঁর মুখ চেপে ধরেন। গালে চড় মারেন। চিত করে শুইয়ে ফেলে চেপে থাকেন। এত কড়া সেডেটিভে কাজ হতেই হবে। দেশপাণ্ডে বড় উপকার করেছে। কড়া সেডেটিভ, অথচ স্বাদ প্রায় নেই। বড় কাজ দেয়।

ইলা শান্ত, শান্ত হলে দেশাই ইনজেকশান গোছান। ইলার চোখে জল পড়ছে। ইনজেকশন দেবার সময়ে চোখ দিয়ে জল পড়লে দেশাইয়ের বুক ফেটে যায়। কিন্তু ইলা ! এ তো তোমারই ভালোর জন্যে। তুমি ঘুমিয়ে থাকো, নিঃসাড়ে থাকো, তাহলেই তো আমি তোমায় বাঁচাতে পারব।

ইলা না হয় পাগল! তাই "বাঁচাও, বাঁচাও" বললে কেউ শুনেও শোনে না। কিন্তু এ সব বাড়িতে সত্যিই যদি বিপন্ন কেউ চেঁচায়, তবে কি প্রতিবেশী ছুটে আসবে ?

আজ অনেক কাজ। সারাদিন ইলাকে শুইয়ে রাখতে হবে ঘুম পাড়িয়ে ? রাত গভীর না হলে যমুনাকে সরানো যাবে না। কোথায় সরাবেন। কি ভাবে সরাবেন তা ভাবতে হবে। যমুনাকে সরাবেন। কয়েকদিন বাদে ইলাকে বোম্বেতে নিয়ে দেশপাণ্ডের মেণ্টাল হোমে স্থায়ী নির্বাসনে দেবেন। তারপর কলকাতার বাড়ি বেচে দিয়ে বম্বেতে কোনো জায়গায় থেকে যাবেন। ছেলের কাছে নয়। বম্বেতে না থাকলে ইলাকে দেখতে পাবেন কি করে ?

কোথায় কোথায় কাজ করত যমুনা ?

অর্জুনবাবুর বাড়ি ! তারপর এগারো নম্বর, হ্যাঁ এগারো নম্বর।

এগারো নম্বর ফ্ল্যাটের কেয়ারটেকার মহসীন। ও ফ্ল্যাটে ঢোকার সদর ও খিড়কি করিডোরে চিরহরিৎ সব গাছের টব।

সেই করিডোরে বসে যমুনা আর মহসীন কত হাসাহাসি করে, সিগারেট খায়, সব ওঁর দেখা। যমুনার কোনো নীতিবোধ নেই। অশিক্ষিত যেমন, অসভ্য তেমন। আসলেও অন্য কোথাও মরলে দেশাই এত ভাবতেন না। তাঁর বাড়িতে মরে পড়ে আছে বলেই যত ভাবনা।

যাক, বারান্দায় যাওয়া যাক। রোজই বারান্দায় মিনিট দশেক জগিং করেন। যা রোজ করেন, তা না করলে মানুষ সন্দেহ করবে। সন্দেহ দেশাই চান না।

মুখোমুখি ব্যালকনি।

দেশাই যে কারণে জগিং করছেন, অর্জুনও একই কারণে জগিং করছেন। স্বাভাবিক থাকতে হবে ব্যবহারে আচরণে। দেশাইকে দেখেই অর্জুন বুঝে ফেলেন ভোর রাতে পোঁছে খিড়কি দিয়ে ঢুকে তবু বুড়ো জগিং করছে কেন!

উল্লাসে উতরোল হন অর্জুন। তাঁর যমুনাকে তো ওর ঘরেই পাচার করেছেন। মুখ দেখে বুঝবে কিছু? কি ভয়ানক বুড়ো এই দেশাই।

—হাই!

—হাই!

—শুভসংবাদটি কবে শুনব?

—মাসখানেক বাদে তো বটেই।

—ভালো, খুব ভালো।

—মিসেস দেশাই কেমন আছেন?

—যেমন থাকেন।

—কাল রাতে বম্বেতে হঠাৎ ঝড়বৃষ্টি হয়েছে রেডিওতে শুনলাম।

—বলেন কেন! তাতেই তো প্লেন ছাড়তে দেরি করল। ইলার জন্যেও মনটা তো খুব ব্যস্ত থাকে!

—কোথায় গেছলেন?

—কোথায় আর, বম্বে!

—ছেলের কাছে ?

—ছেলে, ইলার ডাক্তার···

—সকালে গিয়ে রাতে ফেরা···

—জেট যুগ এটা।

—বেরোবেন না ?

—না। ইলার শরীরটা···

—সত্যি। আপনি যে ভাবে ওঁকে দেখেন, এমনটি এখন দেখা যায় না।

—আমাদের চল্লিশ বছর বিয়ে হয়েছে। প্রায় চৌত্রিশ বছর তো ইলাই আমাকে দেখেছে। আমি বাকি কয়েকটা বছর দেখব না ?

—আমাকে বোধহয় দু'তিন দিন হলদিয়া যেতে হবে।

—মিসেস তো বাপের বাড়ি!

—হ্যাঁ, বাপের বাড়িই ভালো এসময়ে। এতবয়সে ছেলেপিলে হওয়া···

—ভাববেন না অর্জুনবাবু। আমার দিদির প্রথম সন্তান হয় বত্রিশ বছরে। বিয়ের তেরো বছর পর। আর তখন দিনকাল ছিল অন্যরকম। বিজ্ঞানের এত উন্নতি তো হয় নি।

—আমি ওর জন্যে ভাবব কি! ও আমার জন্যে ভেবে ভেবেই গেল। কি করে সংসার চলছে, কি খাচ্ছি, হেন রে, তেন রে!

—স্ত্রীদের ভাবনা করাই কাজ।

—যা বলেছেন···দাঁড়ান, বাহাদুর যেন কি জিজ্ঞেস করছে আপনাকে।

—কি বলছ, বাহাদুর ?

—দেশাই সাব! এগারো নম্বরের মহসীন জিজ্ঞেস করছে যমুনা কি কাজে এসেছে ? ওদের ওখানে কাল বিকেলেও যায় নি।

অর্জুন তাড়াতাড়ি বলেন, আমাদের বাড়ি তো আসে নি। দেশাই, আপনার বাড়ি এসেছিল কি ?

দেশাই চমৎকার সহজ ভাবে বলেন, কাল বিকেলে সে আসে নি সে তো ঘরদোর দেখেই বুঝতে পারছি। আজ এখনো আসে নি, আমার এখানে

অবশ্য বেলায় আসে। আমার মিসেসকে জিজ্ঞেস করে যে কোনো লাভ নেই, সে তো সবাই জানে।

অর্জুন বলেন, বাহাদুর! বলে দাও আমাদের দু'বাড়ি আসে নি। মানে, এখনো আসে নি।

বাহাদুর চলে যায়।

অর্জুনের মন বলে, দেশাই! মাথা নত করি তোমার চরণে। তোমার বাথটবে যমুনা, তবু কেমন সহজে কথা বলছ! যদি বম্বে থেকে এসে থাকো, তবে ওই দরজা দিয়েই ঢুকেছ এবং দেখেছ তাকে।

না কি দেখ নি? সামনের দোর দিয়ে ঢুকেছ? যাকগে, আমি যে ও মাল ওখানে রেখেছি তা তো জান না।

নাঃ। অর্জুন খুবই নিরাপদ। মহসীন জিজ্ঞেস করছে যখন···

মহসীন কম বাঁদর নাকি? যমুনা সব বলেছে অর্জুনকে।

যমুনা বলত, কি পাগল ছেলে গো! বলে চলে আয়, আমরা বিয়ে করি।

অর্জুন তখন যমুনার খুব কাছাকাছি, ওর পিঠ থাপড়াচ্ছেন। তেমন সময়েও তিনি চমকে উঠতেন।

—যমুনা, তোমার না স্বামী আছে?

—ওরও বউ আছে।

—না যমুনা, ও মুসলমান।

—মরো মিনসে। মুসলমান তাতে কি? চাইলে ওর সঙ্গে চলে যাব। এখনো সোয়ামির পথ চেয়ে আছি তাতেই ওকে বলি না কিছু।

—ছি ছি মুসলমান!

—তুমি তো হিন্দু, ধর্ম করছ?

—তবু, মুসলমান!

যমুনা এলিয়ে বসেছিল দেয়ালে হেলান দিয়ে। তারপর বলেছিল, মহসীন আমাকে বড্ড ভালবাসে। গেস্টো আসবে, মুরগি বলো, পোলাও

বলো, আমাকে খেতে দেয়। তোমার মতো বদমাশ নয়।আজও আমার গায়ে হাত দেয় নি। সেদিন বিরিয়ানি দিল!

—তাতেই এমন স্বাস্থ্য তোমার!

—মহসীন খাইয়ে দাইয়ে ঘোড়া জোয়ান করছে,আর তুমি ভদ্দরলোক! বাবু! ঘোড়ার পিঠে চাপছ! মরণ তোমার আমা' হতেই হবে মড়া-খেগো!

—যমুনা, ভাষা! ভাষা!

—ভাষা আবার কোন্ মন্দ?

—মুখের বুলিটা ভালো করো।

—বুলি! বুলির বাপ তুলি!

—ছি ছি যমুনা, তোমাকে আমি···

—কি, টাকা দাও?

—তাও তো দিই।

—দেবে না তো কি, মিনি মাংনা।

—ভালোবাসি তোমাকে।

—বেশ তো! বউদি আসুক ছেলে নিয়ে। তার সামনে বলব, তোমার সোয়ামি আমায় ভালবাসে বউদি। আমি তোমার সতীন!

—ও কাজ কোর না যমুনা!

—বউকেও খুশি রাখব, ঝিকেও নষ্ট করব, ভদ্দরলোকের মাথায় ঝাঁটা মারো।

এখন অর্জুনবাবুর মনে হয়, যমুনার এ অবস্থার জন্যে যদি মহসীন দায়ী হয়? যমুনাকে বিষ যদি মহসীন দিয়ে থাকে?

যাক গে সে সব কথা। যা হয়ে গেছে তা নিয়ে ভেবে বা কি হবে, আর সাপ খুঁচিয়ে বা কি লাভ?

দেশাইকে ফাঁসালেন! এটা ঠিক হয় নি। কিন্তু নিজেকে বাঁচাতে হবে যে!

দেশাই জগিং চালিয়ে যান। জগিং করতে করতে বলেন, মিসেসকে নিয়ে বম্বে যেতে হবে। ছেলে বলছে, মা আমার কাছে থাকুন।

—ছেলের মতো ছেলে আপনার।

—হ্যাঁ, খুব ভালো ছেলে।

—ভালো হবে না কেন ? আপনাকে তো আমরা সবাই বলি আদর্শ স্বামী! মিসেসের জন্যে দুঃখ করি। কে ভেবেছিল উনি এমন হয়ে যাবেন ? কি প্রাণ! কি উদ্যম! প্রতিটি ভালো কাজে এগিয়ে যাবেনই যাবেন।

—সেটা চিরদিনের স্বভাব। এমনটি আর দেখি নি, আর দেখব না।

—সবই ভাগ্য!

—ভাগ্য নয় অর্জুনবাবু! ইলা অসুস্থ, এটা ওর রোগ। আমাদের দেশে এর চিকিৎসা মোটে এগোয় নি। এদের জন্যে কোনো ব্যবস্থাও নেই। অথচ এ রোগ বেড়েই চলেছে। দেখুন গিয়ে আমেরিকাতে। ছোট শহরেও এদের জন্যে ব্যবস্থা আছে। অনেক দেশেই আছে।

—ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয়।

—যা বলেছেন!

—কুঙ্কুম আপনার যা প্রশংসা করে!

—ও আমার মেয়ের মতো। সুচেতনা বেঁচে থাকলে ওর কাছাকাছি বয়স হতো। সুচেতনা বেঁচে থাকলে ইলাও হয়তো···আচ্ছা, চলি এখন। আবার দেখা হবে।

বউকে নিয়ে বম্বে যাবে দেশাই ? ছেলের কাছে রাখবে ? ছেলে তো মাকে দেখতে কখনো আসে না, তুমিই যাও। বোধহয় এবার বউকে কোনো জায়গায় পাকাপাকি রাখবে। তা করো। পাগল নিয়ে ঘর করা যায় না।

এখন কি করবে ?

তোমার বাথটবে না যমুনা ?

অর্জুনবাবু ভাবতে থাকেন। দাঁড়িপাল্লার হিসেবে তিনি আর দেশাই, কে কতটা ভাগ্যবান। পাল্লা তো তাঁর দিকেই ভারি বলে মনে হচ্ছে।
দেশাইয়ের ঘরে যমুনা।
তাঁর ঘরে যমুনা নেই।
ইলা দেশাই ভয়ঙ্কর ভাবে উন্মাদ।
কুঙ্কুম পাগল নয়।
ইলা দেশাই শর্টস আর গেঞ্জিও পরেন।
কুঙ্কুম শাড়ি পরে।
দেশাইয়ের জীবন অন্ধকার।
তাঁর এখন তুঙ্গে বেস্পতি। ঠিকাদারি ব্যবসা চলছে, চলছে, চলবে।
এখন তাঁকে সুকৌশলে চলতে হবে। আর তেমন ওষুধ খাবেন না, যাতে অসংযম আসে। আর যুবতী ঝি রাখবেন না।
কেষ্টকালীকে জানাতে হবে।
টেলিফোনে কিছু বলবেন না। নিজে যাবেন, বলবেন, কোনো ব্যবস্থার দরকার হ'ল না ভাই। ওটা ছিল যমুনার হিসেবের গণ্ডগোল। আপনা থেকেই সমাধান হয়ে গেল।
যাক গে। এটাই মহা শান্তি যে যমুনা তাঁর ঘরে নেই।
সারা দিনটা নয় কুঙ্কুমের কাছে থাকবেন। ওকে খুশি রাখা খুব দরকার। কুঙ্কুম তাঁর ঘরের লক্ষ্মী, কারবারের লক্ষ্মী। ওর মনেও এখন ওঁর জন্যে বড় কাতরতা।
সন্ধ্যায় অনেকদিন পর ম্যাগ্নোলিনা বারে যাবেন। সেখানে বন্ধুরা থাকবে। ওদের সঙ্গে অনেকদিন মদ খাওয়া হয় নি।
অনেকদিন চুরচুরে মাতাল হয়ে ঘরে ফেরা হয় নি। মদ খাবেন, রাত গড়িয়ে অনেক গভীরে গেলে তবে ফিরবেন।
রাত! রাত! দেশাই, তুমিও রাত খুঁজবে, খুঁজতেই হবে। ততক্ষণে যমুনার অবস্থা কি দাঁড়াবে?

তুমি মরো দেশাই, আমি বাঁচি। আমার বাঁচাটা দরকার।

অর্জুন ঘরে এসে মহানন্দে স্নান করেন। স্নানের মতো ভালো কিছু আর নেই।

বাথরুম থেকে বেরোলে মোহিনী ওঁর দিকে তাকায় এবং বিরস গলায় বলে, রান্না কি কি হবে? সব বলে দিন। রান্না করতে সময় যাবে, আপনি খেয়ে বেরোবেন তো?

—না না, আমাকে বেরোতে হবে। রান্নার দরকার নেই। রাতেও আমি খেয়ে ফিরব।

—মেশিনে তো কাঁড়ি ধরা আছে। ইলিশ মাছ, মাংস, নিরিমিষ তরকারি, ভাত!

—সব বের করে নাও, নিয়ে যাও।

—যমুনাও এল না, ঘরদোরও পড়ে থাকল। মেয়েটার হ'ল কি?

—থাকুক ঘর-দোর। ঝটপট সব বের করে নাও। আমাকে বেরোতে হবে।

—জিনিসগুলো নেব বা কেমন করে?

—যেমন করে হোক নাও।

মোহিনী ওঁর সামনে নিশ্বাস ফেলে। তারপর মহানন্দে ফ্রিজ খালি করতে থাকে। বাবুদের সব বেয়াড়া কাণ্ড। এমন দেবভোগ্য সব জিনিস, কিছুই খাবে না? না খেলে। মোহিনীরা সপরিবারে খাবে। খুব আনন্দ করে খাবে।

যমুনা এল না বা কেন?

কয়েকদিন ধরেই যমুনার মুখ ভার, কাজে মন নেই। বাবুর সঙ্গে তো খুব জমেছিল ওর। মোহিনী কি আর বোঝেনি? বউদির সাবান মাখছ, স্যাম্পু মাখছ, তোয়ালে নিচ্ছ।

বাবুর আদর পেয়েছ বলে এমনটা করছ। মোহিনী বলেওছিল, অত বাড়িস নি যমুনা, অত সইবে না।

যমুনা বলেছিল, আমি কি করব ? ওই মড়াখেগো আমাকে গিলে খেল মাসি !

—কি জানি বাছা !

—মড়াখেগো, বুড়ো বদমাশ !

গিলে খেল মানে কি করল ? কাল সকালে যখন এসেছিল যমুনা, মুখ চোখ থমথম করছিল। দোর বন্ধ করে বাবুর সঙ্গে জোরে জোরে কথা বলছিল। এ সবের মানে একটাই হয়। মোহিনী সবই বোঝে ; যাকগে, যমুনার কথায় তার দরকার কি ? সে চাল, ডাল, তেল, রাঁধা ব্যঞ্জন এ সব সরাচ্ছে।

বাহাদুর কিছু সরায় না। ও সবই দেখে যায়। বাবুর হাত দরাজ। সে বউদিরও। টাকা, জামা-কাপড়, কি না দেয় ? সব দেয়।

সব গুছিয়ে নিয়ে ও বলে, চললাম গো বাবু। কাল সকালে বাজার করতে হবে।

—হ্যাঁ…এসো।

অর্জুন খালি বাড়িতে নেচে নেন এক পাক। বাহাদুর ছেলে ভালো। বিছানা তুলে,ঝেড়ে পরিষ্কার করে রেখেছে। ছাড়া জামাকাপড় রেখেছে গামলায়। কাল পরশু বাদে একটা ঝি…

গাড়ি চালাবার সময়ে অর্জুনবাবুর মনেও পড়ে না, যমুনার কাছে যে চাবি থাকতো, সেটা কোথায় গেল।

দেশাই ঘরে ঢোকেন। তারপর বেরিয়ে জমাদারকে খোঁজেন। জমাদার সামনের ফ্ল্যাট থেকে বেরোচ্ছিল।

—সালাম সাব।

—হ্যাঁ। শোনো জমাদার, হোটেলে একটু খবর দেবে যে আজ খাবার আসবে না আমার বাড়ি ?

—কা আপ লোগ নেহি খায়েংগে ?

—মাইজীর শরীরটা ভালো নয়, আমারও ভালো লাগছে না।

—মাইজীর জন্যে আপনার বহোত তকলিফ হ'ল সাব!

দেশাই বিষণ্ণ হাসেন, সবই কপাল জমাদার। আমি কি করবো বলো?

—পূজাতাজা করলে···

—দেখি!

জমাদার চলে যেতেই দেশাই গেস্টরুমে ঢোকেন। বন্ধ করেন দরজা, লক করেন, তারপর বাথরুমে ঢোকেন।

যা ভেবেছেন ঠিক তাই হয়েছে। হালকা পচা গন্ধ উঠছে, পেট ফুলছে, রস কাটছে। এ এক অদ্ভুত অবস্থা।

ফিনাইল ঢালবেন?

না না, গেস্টরুমের মেঝেতে পলিথিনের চাদর বেছাবেন। ও ঘরে তো খাট, টেবিল, আলমারি সবই ভারি পলিথিন চাদরে ঢাকা। সুচেতনা কোনোদিন যদি আসে ভেবে···

গেস্টরুমের মেঝেতে যমুনাকে পলিথিন চাদরে শোয়াবেন। মাথার নিচে তোয়ালে রাখবেন। মুখ, কান, নাক, তুলো ঠেসে দেবেন। ঘরে এয়ার-কুলার ও পাখা চালাবেন।

সব করবেন তিনি। ইলাকে বিপদে ফেলতে পারবেন না, অসম্ভব। ইলাকে বাঁচাবার জন্যে সব কিছু করতে পারেন তিনি।

দেশাই জীবনে জানেন নি, তিনি এমন কাজ করতে পারবেন। জীবনে তো দরকারও পড়ে নি। দরকার পড়লে সবই করতে হয়।

পলিথিনের শীট বেছান। তারপর দমবন্ধ করে ওই ভারি, ভীষণ ভারি শরীর তুলে সে চাদরে শোয়ান। মাথার নিচে ভারি টার্কিশ তোয়ালে দেন। অদ্ভুত গন্ধ, অদ্ভুত। সুচেতনা হাসিমুখে দেখছে বাবাকে।

তোর মায়ের জন্যে মা! আমার এতে কোনো হাত নেই রে!

মৃত্যুর পর দেহ প্রথমাঙ্কে নরম, দ্বিতীয়াঙ্কে কাঠ, তৃতীয়াঙ্কে আবার নরম। যমুনা সবে তৃতীয়াঙ্কে পৌঁছেছে।

চোখের কোণে জল শুকিয়ে আছে। এখনি ওকে সরাতে পারলে ভাল হতো, তা তো হচ্ছে না। চলুক, এয়ারকুলার চলুক, পাখা চলুক। স্পিরিট দিয়ে ওকে মোছাবেন? একটু ফুলেছে পেটটা। ওই পেট আরো ফুলবে।

যমুনার ব্যবস্থা করার পর ফিনাইল ঢেলে বাথটবটি ধুয়ে ফেলেন দেশাই।

এখন ওঁর অনেক কাজ। বাথরুমে ও ঘরে ওডোনিল ছড়ানো। এত কাজ আছে যে ইলা! তোমাকে আবার সূচ দিয়ে ঘুম পাড়াতেই হবে। দু'এক দিন উপোসে তোমার কিছু হবে না।

কেন, কেন ওকে মারলে ইলা? কি দিয়ে মারলে? তুমিই মারলে, না অন্য কেউ···

আজ তুমি ঘুমিয়ে থাকো। রাতে ওকে পাচার করে, গেস্টরুম পরিষ্কার করে, কাল সকালে তোমাকে স্নান করাব, খাওয়াব। এ রকম ভাবে অজ্ঞান করে রাখার পর তোমাকে সামলানোও সহজ হয়।

কাল এখানে ডাক্তারকে ফোন করব। আপাতত ওর নার্সিংহোমে রাখব। তারপর বম্বেতে ট্রাঙ্ককল করে সেখানে নিয়ে যাব।

খাবার ঘরে যেতে একটা টক টক গন্ধ ওঁকে আক্রমণ করে। টিফিন কেরিয়ার খোলা, খাবার ছেটানো, পচেও উঠছে।

সব, স——ব পরিষ্কার করেন দেশাই। বাড়িটা ঝকঝকে করে ফেলেন। কয়েকবছর ধরেই এ সব কাজে উনি অভ্যস্ত।

সব জঞ্জাল করিডোরের কোণে রাখেন ঢাকনি দেওয়া টিনে। জমাদার নিয়ে যায়। ইলার জন্যে এ বাড়িতে জমাদার ঢোকে না। এখন মনে হচ্ছে সেটা ভালোই।

ওঁর সুবিধে, লিফটম্যান, জমাদার, ঝি, চাকর থেকে সবাই ওঁর প্রতি খুব সহানুভূতি দেখায়। "বর্ণমালা"র ইতিহাসে পাগল বউয়ের জন্যে স্বামীর এমন স্বার্থত্যাগ আর একটি নেই।

ঝি-রা বলে, জন্ম জন্ম তপস্যায় এমন স্বামী পেয়েছিল মেমসাহেব, রাখতে

পারল না, ভোগ করতে পেল না।

তারপর স্নান করেন আবার। ফ্রিজ খুলে টোমাটো স্যুপের টিন বের করেন, পাঁউরুটি নেন, কফি বানান। টেবিলে বসে খান।

মহসীন, মহসীন, আমাকে একজন ফাঁসিয়েছে, আমি তোমায় ফাঁসাব। তুমি পুলিশে জড়াবে, তোমার খুব ঝামেলা হবে। ক্ষমা করো মহসীন, ইলাকে বাঁচাবার জন্যে এ কাজ করতে হবে আমাকে।

বাড়ির নকশা যারা করেছে তাদের বাহবা দিতে হয়। প্রতি ফ্ল্যাটের গেস্টরুমের বাথরুমের দিকে লিফ্‌ট : জমাদার, ঝি. চাকর আসে। ওখানে কম পাওয়ারের বাতি জ্বলে। করিডোর দিয়ে টেনে কোনো মতে এগারো নম্বরের করিডোরে পৌঁছে দিতে পারলে দেশাই বেঁচে যাবেন।

মহসীন কি করবে, করুক।

৮

মহসীন কিছুই বুঝতে পারছিল না।

ব্যাপারটা বেশ সন্দেহজনক। যমুনা কাল বিকেল গড়িয়ে এল, মুখ-চোখ যেন কেমন, শরীর যেন টলছে। দরজায় হেলান দিয়ে বলল, আজ আমি কাজ করতে পারব না রে। শরীর কেমন করছে, মাথা ঘুরে যাচ্ছে। খোঁড়া ডাক্তার যে কি ওষুধ দিল।

—কি জন্যে ওষুধ খেলি?

—মেয়েছেলে যে জন্যে খায়।

—ও!

—আমি গিয়ে বাবুর ঘরে শুয়ে থাকি, যদি ভালো লাগে। সব যেন জ্বলে যাচ্ছে।

—আমি তোকে এত মোহববত করলাম রে যমুনা, তা তুই বুঝলি না। ওই বাবুটা···

—সব জ্বলে যাচ্ছে রে, অম্বলের জ্বালা যেমন! তোকে ছাড়া কাকে বলব?

—আমাকে তো বিশ্বাস করলি না!

—সব চলে যাচ্ছে রে! দেখ, তোর কথা শুনলাম না। বাবুটাও আমাকে ···শুধু সেই ঢ্যামনার জন্যে বসে থাকলাম, জীবনটা আমার জলে ভেসে গেল।

—অমন করে বলিস না।

—সে যদি না ফেরে, একটা মাস দেখব, তারপর তোর সঙ্গে চলে যাব রে।

—সত্যি ?

—সত্যি, সত্যি, সত্যি।

যমুনা কেন যেন গভীর মমতায় মহসীনের বসন্তখচিত মুখে বার বার হাত বুলিয়েছিল।

—তুই ছাড়া কে আমাকে ভালবাসে ?

—ওই অর্জুনবাবুটা…

—মড়াখেগো পিশাচ রে! যাই!

—ঢুকবি কি করে ?

—চাবি আমার কাছে না ?

জামার ভেতর থেকে রুমালে বাঁধা চাবি বের করে দেখিয়েছিল যমুনা। যমুনা, যমুনা! তুই কোথা দিয়ে ঢুকিস, কি করিস, সবই জানে মহসীন! তবু ওর সঙ্গে সাচ্চা প্যার হয়ে গেল। সাচ্চা প্যার বড় পবিত্র জিনিস। মহসীন আর যমুনা এক সঙ্গে খাবার খেয়েছে, সাদা ফুঁকেছে, কিন্তু মহসীন ওকে বেইজ্জত করে নি, গায়ে হাত দেয় নি আজও।

যমুনা কেন যেন বারবার কথা বলছিল থেমে থেমে, তুই সবার মতো নয় তো! অন্যেরা চায় শুধু…বিপদে ফেঁসে গেলাম, নইলে…অনেক টাকা পাব রে মহসীন! তুই আর আমি কোথাও গিয়ে দোকান দেব। সে আর আসবে না, মন বলছে বারবার।

যমুনা চলে গেছল। সে চাবি দেখাল, বলল ওখানে গিয়ে শুয়ে থাকবে। অথচ যমুনা বেরোয় নি।

বাবু কেন বলল, কাজে আসে নি ? আসে নি তো নিশ্চয়। পাগলী মেমের বাড়ি, অর্জুনবাবুর বাড়ি, মহসীনের বাড়ি, কোথাও আসে নি যখন, তখন কাজে সে আসে নি।

অথচ কাল অর্জুনবাবুর বাড়ি ঠিকই ঢুকেছিল।

মহসীন সাক্ষী আছে।

তবে কি রাতেই চলে গেল?

মহসীনের ভেতরে আসল মহসীন মাথা তুলতে থাকে, হিংস্র সন্দেহে চারদিক বিচার করে। এই মহসীন তামাক কোম্পানীর গেস্টহাউসের কেয়ারটেকার মহসীন নয়। এই মহসীন ডক এলাকার প্রাক্তন সৈনিক।

"বর্ণমালা"র লোকরা প্রত্যেকে এসেছে একই বেসরকারী কর্মবিনিয়োগ সংস্থার কাছ থেকে। সংস্থা মানে একটি বিশেষ ব্যক্তি। তিনি এই এলাকার নামহীন সম্রাট। তাঁকে টপকে চলা যায় না। যে চেষ্টা করেছে সেই গেছে মায়ের ভোগে।

এ বাড়ি এবং অন্য বহুতল বাড়িগুলির ম্যানেজমেণ্ট আপিস ওই বিশেষ ব্যক্তির সঙ্গে সমঝোতা রেখে চলে। বিশেষ ব্যক্তি বর্তমানে কোনো ফুটকি নাটকিতে নেই। তবু যারা তাঁর হয়ে কাজ করেছে এতদিন, তাদের বিভিন্ন কাজে লাগানো তাঁর কর্তব্য।

বিশেষ ব্যক্তিকে চোখে দেখে নি অনেকেই। দীর্ঘকাল যাবৎ তিনি দিনে ঘুমোন।

সন্ধ্যা ছ-টা ওঁর ভোর।

উঠবেন, মুখ ধোবেন, মালাই-চা খাবেন। তারপর দাঁতন, কৃত্য, স্নান।

সন্ধ্যা সাতটায় প্রাতরাশ।

পোস্ত, মনক্কা, বাদাম, আখরোট।

তারপর দরবার দিয়ে বসা।

খিদিরপুর এলাকার ম্যাপ আঁটা দেয়াল। মেঝেতে ফরাসে উনি। দরজায় পাহারা।

কাজ কারবার, ব্যবসার কথা, হিসেবনিকেশ। দরকারে কারুকে শাস্তি, কারুকে বখশিস।

কিছুকাল উনি তো চুপ করে আছেন। সৎপথে থাকবেন তার উপায় কি!

খানিক চোরাচালান মাল খালাস, খানিক বিক্রিবাটা। কোকেন থেকে সোনা। ওষুধের কেমিক্যাল থেকে ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি। বন্দুকের পার্ট থেকে বেবিফুড!

অনেকে বলে উনি অপরাধী, সমাজবিরোধী।

অনেকে বলে উনি অন্নদাতা।

উনি শুধু ওপর পানেহাত দেখান। যা করাচ্ছেন, ওপরঅলাই করাচ্ছেন। বিশেষ ব্যক্তি নিমিত্ত মাত্র বই তো নয়।

এখন কাজে মাতার সময় নয়।

এখন বসে থাকার সময়।

তবু, কতজনের কাজের কথা না ভাবতে হয়। ওরা কি ভেসে যাবে? বস্তিগুলো সবই ওঁর। যেমন ওঁর জমিতেই বর্ণমালা ও অন্যান্য বাড়ি। এ সব বাড়িতে যতভাবে হোক ওঁর লোকজনদের ঢোকাতে হয়েছে। মহসীন বিব্রত, বিব্রত।

ওঁকে কি বলবে? উনি তো সব—জানে। কতকাল আগে উনি ওকে সস্নেহে বলেছেন, ও মেয়েটাকে বিয়ে তুমি করতে পারো। কিন্তু তোমার যে বউ আছে। তার সম্মতি নাও। তার ভালো ব্যবস্থা করো, নইলে তো…

মহসীন অগত্যা ম্যানেজমেণ্ট আপিসের দরোয়ানকে খোঁজে।

সে নেই।

যাবে, যমুনার বাড়ি যাবে! কেমন করে যাবে? তামাক কোম্পানির গেস্টহাউসে কয়েকদিন হ'ল বড় সায়েবের জিগারদোস্ত অজ্ঞাতবাসে রয়েছে।

বছরে একবার মক্কেল অজ্ঞাতবাস করে যায়। লোকটা লেখে। পুজোর লেখার সময় এলেই ওর নাকি একলা থাকা দরকার হয়। বড় সায়েবের আবার এ সব বাতিক প্রচণ্ড। বিদেশ ওঁর ঘর বাড়ি। ঘন ঘন ফোরেনে যায়। কিন্তু গাইয়ে। বাজিয়ে। লেখক। আঁকিয়ে—এঁদের বিষয়ে ভয়া-

নক দুর্বলতা।

বড় সায়েব নাকি কবিতা লিখত।

ফি বছর এ লোকটাকে বড় সায়েব মহসীনের ঘাড়ে চাপাবেইচাপাবে।

কত নির্দেশ।

কেউ আসবে না। উনি বেরোবেন না।

স্কচ, মুরগি, যখন যা চান স-ব···

উনি যে কত বড় মানুষ···

লোকটাও অদ্ভুত। যখন তখন মহসীনকে পিলে চমকে দেয়।

—ফরজ কি ?

—ভাদ্রমাসে বারুইপুরে কি ফুল ফোটে ?

—ডকে রাতে কি হয় ?

—ওই মেয়েটাকে তুমি ভালবাস ? কি হয়েছে ? ওর স্বামী আছে। তোমার স্ত্রী আছে, কিন্তু মহসীন, ভালবাসা হ'ল দেবতা। তাকে মানতে হয়।

—আমার ভালবাসার আকাঙ্ক্ষা মেটে নি মহসীন। আজও আমি ভালবাসা পাই নি।

শোনো কথা! বউ ছেলে, পুত্রবধূ মেয়ে, জামাই নাতি-নাতনি দশটা, বুড়োর শখ কত।

কখন ডাকবে, কখন বলবে আমের মুকুল ঠিক কোন্ সময়ে ফুটবে ? সে জন্যেই মহসীন বন্দী, বড় সাহেবও তো যখন তখন চলে আসে বোতল নিয়ে।

ফোরেন মাল খাওয়ায়। জিগরী দোস্ত তো ?

তখন দুজনে কত গল্প।

—আমাকে নিয়ে কবে লিখছ ?

—লিখব, লিখব।

—কবে ?

—তোমার জীবন তো এখনো ছুটছে। নিজে নিজের জীবন লেখা শেষ করো আমি ধরব।

—এ জীবন অশেষ, অশেষ…

—শেষ তলানি অবধি পান করো…

—হ্যাঁ। মহসীন। বরফ।

আজ চীনে, কাল মোঘলাই, পরশু বিলিতি খানা চাই লোকটার। সবই তো মহসীন যমুনাকে খাওয়াত। সবই। যমুনা ওর কাছে খেত। স্বামীকে এক রকম গলায় "ঢ্যামনা" বলত। অর্জুনবাবুকে আরেক রকম গলায় ঢ্যামনা বলত।

এ লোকটাকে তো একদিন বলল, আপনি বাবু ভালো মতো ঢ্যামনা বটে। আমার সঙ্গে বকে যাচ্ছেন আর চোখ মারছেন ?

লোকটা কিন্তু রাগ করে নি।

—ক্ষমা করো, ক্ষমা করো যমুনা। তোমাকে দেখলেই আমার…

—বাতিক চাগে ? আ-মিনসে।

—না না, বললাম মেয়ের কথা মনে হয়।

—সে আমার কে ?

—সে যে কে…

—সরুন, ঘর মুছি।

—মিনসে…ঢ্যামনা আমি তোমায় বলছি মহসীন। সাহিত্যে জনগণের এ সব ভাষা না এলে সাহিত্যের মুক্তি নেই। সতীপনা করে করে বাংলা সাহিত্যের সুতিকা জন্মে গেল।

যমুনা বলেছিল। সত্যি বাবু। খাবার পরবার ভাবনা নেই। সিগারেট দু-টান মেরে ফেলে দেন। ফোরেন মাল খান। কথায় কত রঙ্গ না জানেন।

—যমুনা, যমুনা, তুমি অতুলনা।

—ধন্যি বাবা বাবুদের খেলা।

লোকটাও তো যমুনাকে দেখেছে কাল। ওকে জিজ্ঞেস করবে মহসীন? বেরোবে যে, তাও তো রাত না হলে···বড় সায়েব আসতে পারে, বড় সায়েবের বউ আসতে পারে।

বউ মুটকি ছিল। দোকানে গিয়ে শুঁটকি হয়েছে। চুল কেটেছে, প্যান্ট পরছে, কত ঢং।

স্বামীর সামনে লোকটাকে বলে, অলকবাবু।

স্বামীর আড়ালে সে কি ন্যাকামি। অলক, অলক, বলো আজ কবার তুমি আমার কথা ভেবেছো?

—কখন ভাবি নি?

—ইস্। ঘরে শুধু গোলাপ? তুমি লিখবে কি করে অলক? কি করে?

—তুমিই তো ফুল হয়ে এসেছ।

—ও, অলক, অলক।

স্বামী আসতে পারে। স্ত্রী আসতে পারে। মহসীন নেই তো তার চাকরি গেল।

মহসীনের মনটা কেমন হয়ে যায়। আসলে নিচের আপিসের দরোয়ানটাকে চাই। ও বিশেষ ব্যক্তির পেয়ারের লোক। ওর ক্ষমতা অপার। যে কোনো তালা খোলা ওর কাছে ছেলেখেলা।

যমুনা ও মহসীনের ব্যাপারে ও মহসীনের দলে।

—এ ছোকরি। তোর সাতপুরুষের ভাগ্যি যে মহসীমের মতো ইমানদার ছেলে তোকে প্যার করে।

—আ গেল যা। আমার সোয়ামি আছে না?

—নেই।

—নেই মানে?

—কত সাল সাদী হয়েছে?

—চার বছর গো।

—পুজাতাজা করে সাদী?

—কালীঘাটের বিয়ে।

—আরে চার বছর সাদী হয়েছে, তব ভি তুই মা হোস নি। ও সাদী ফল্‌স।

—বাজে বোকো না।

—সে লোকটাও ভালো নয়।

—তোমায় বলেছে।

—আরে ইউনিয়ন করে যার কাম ছোড়ে যায়, সে তো বুদ্ধু। ইউনিয়ন করবে তো লীডার বনো, দুহাতে কামাও, তা নয়…

যমুনার বুকে বাজে। ফোঁস করে নিশ্বাস ফেলে ও বলে, যা বলেছো। এমন ডক এলাকা কাছে, কত রকম লাইন। ধরতে পার না? না, একই কথা। খেটে খাব, আর খেটে খাব।

—ওই এক কথা।

অগত্যা মহসীন, বাবু একটু ঘুরে আসছি বলে আরেকবারও নামে। দারোয়ান বলে কি খবর।

—কাপ্তান দা!

—কি হ'ল?

—এদিকে এস।

—কা, যমুনা ভাগিস?

—তুমি…তুমি কাল যমুনাকে আসতে দেখেছ বিকেলে?

—জরুর?

—যেতে দেখেছ?

—তা তো দেখি নি। খেয়াল করি নি।

—শোনো।

—এখন নয় ববুয়া। এখন কাজ আছে।

—কখন ডিউটি শেষ হবে?

—ন'টার সময়ে।—একবার, একবার কিন্তু ওপরে এসো।—ফোরেন

পিয়াবি ?

—নিশ্চয় ।

—যাব ।

আবার উঠে আসে মহসীন। আসুক, কাপ্তান সিং আসুক । ওকে বুঝিয়ে পটিয়ে ঘণ্টাখানেক এখানে রেখে মহসীন অবশ্যই যমুনার বাড়ি যাবে !

অর্জুনবাবুর বাড়ি বন্ধ, বোবা নিশ্চুপ ।

পাগলী মেমসায়েবের বর বারান্দায় বসে আছে, চুরোট খাচ্ছে । বেচারা । বদনসীবী বুড়ো। এই বয়সে বুড়ির মাথা খারাপ হ'ল । লোকটা খুব ভালো বটে । বউকে কত সেবাযত্ন করে ।

কত ডাক্তার আসে, কত চেষ্টা করে ।

মহসীনের মনে হয়. ভালো লোকদের জন্যেও খোদাতাল্লা কেন এত কষ্ট মেপে রাখেন ?

নিজের বউয়ের কথা মহসীনের তেমন মনে হয় না ।

বউটা এসেছিল চৌদ্দ বছরে । চেহারাটা হঠাৎ যেন চৌত্রিশ হয়ে গেল। অথচ বয়স কত ? পঁচিশই হবে ।

অম্বলে অজীর্ণে মরো মরো, ছেলেমানুষ করছে তো মহসীনের বোন ভগ্নি-পতি ।

যমুনা, যমুনা, ছুরির মতো মেয়ে । ছুরির মতো চোখা কথা, যমুনা ।

লেখক বলেন কি হ'ল ?

—কেন বাবু ?

—কি রকম মনমরা দেখাচ্ছে ?

—আমাদের কথা বাবু !

—যমুনা আসে নি আজ ?

—না, এল না তো ।

—দেখ ! হয়তো ওর স্বামী এসেছে ।

মহসীন টেবিলে খাবার দিতে দিতে বলে। কিসের স্বামী বাবু?

—কেন, ওর স্বামী?

—স্বামী হলেই কি স্বামী হয় বাবু?

—বলো তো? বেশ কথাটা···

—ভালবাসে না, ফেলে রেখে চলে যায়···যমুনা বড় দুঃখী মেয়ে বাবু···

—জমাদার বলছিল ওর ভাইরা না কি···

—তারা ওর ধরমভাই বাবু। তা কি করবে যমুনা? এরকম এলাকায় খুঁটি না থাকলে জওয়ানী লড়কী থাকতে পারে?

—ধরমভাইরা কি করে?

—কিছু অধরম করে না।

—এ এলাকায়···

—যত খারাপ কাজ বস্তিতে হয় বাবু? বড় বড় বাড়িতে কিছু হয় না?

—না না, তা নয়।

—সব জায়গায় বুরাই আছে। সাচাই আছে। যমুনা খুব ভালো মেয়ে বাবু।

—তুমি ওকে ভালবাসো, সত্যই ভালবাসো। এ রকম দেখা যায় না।

—মেয়েটা বোকা। নিজের ভালো খারাপ বোঝে না। আর জবানের ওপর লাগাম নেই। যা মনে হবে, বলে দেবে।

—হয়তো ওর স্বামী আসে নি। হয়তো ওর অসুখবিসুখ করেছে।

—অসুখ!

মহসীনের মনে হয়, তাই তো! কাল তো ও অসুস্থই ছিল। তবে কি অ-বাবুর বাড়িতেই পড়ে আছে অসুখ হয়ে?

না না, বাহাদুর তা হলে বলতো।

তবে কি খবর চলে গেছে? সেই এলতলা বেলতলা পেরিয়ে একখানা ঘর?

কি বলল। খোঁড়া ডাক্তারের ওষুধ···

—বাবু! একবার যাব?

—কোথায়। ওর খোঁজ নিতে?

—হ্যাঁ বাবু। যাব আর আসব। বড় সায়েব, কি মেমসায়েব এলে···

—আমি বলব, তোমার বউয়ের খুব অসুখ। বলব যে, তুমি দেখতে গেছ।

—আল্লা আপনার ভালো করবেন হুজুর।

—তোমার বয়স কত, মহসীন?

—হিন্দুস্থান পাকিস্থানের বছরে পয়দা হলাম বাবু। মা বলতো।

—আটত্রিশ বছর! হয়, এ বয়সেও ভালবাসা হয়। ভালবাসার তো বয়স নেই।

—বহোত মন পড়ে গেল বাবু।

—যাও, ঘুরে এসো।

—টেবিল সাফা করে দিই।

—থাক না।

—না বাবু, বড় সায়েব দেখলে···

টেবিলে সাফ করতে করতে কাপ্তান সিং এসে পড়ে মশমশিয়ে।

ওর নাম "কাপ্তান" নয়, পদবী "সিং" নয়। কিন্তু বিশেষ ব্যক্তি যে ব্যক্তিগত ফৌজ তৈরি করেছিলেন তাতে কলিয়ারির প্রাক্তন মস্তান রাম সাউ ক্যাপ্টেন হয়ে যায়।

বিশেষ ব্যক্তি ওকে "কাপ্তান সিং" নামেই রেশন কার্ড করিয়ে দেন। এ বাড়ির দরোয়ান, লিফটম্যান, জমাদার, সবাই ঝকমকে খাকি-সবুজ ইউনিফর্ম পরে। কাপ্তান দামী জুতোও পরে।

—কি হল ববুয়া?

—বলছি।

"বলছি" বলেও বলে না মহসীন। ও ভেবে দেখে, কাপ্তানের কাছে বলার থাকলে পরে বলবে। এখন খোঁজ নেওয়া যাক।

—আও দাদা, পিও।

বড়সায়েবের ফোরেন বোতল একটি দেয় মহসীন। বলে, একটু বাইরে যাচ্ছি দাদা। এসে বলব সব। চল। মৌজ করো।

—যমুনার খোঁজে ?

—হ্যাঁ দাদা

—যা। ছোকরিকে তুলে নিয়ে আয়। আমি তোদের সাদী করিয়ে দেব। যা। আমি তো আমার পেয়ারি পেয়ে গেলাম।

কাপ্তান ও মহসীন একসঙ্গেই নামে। কাপ্তান বলে, এগারো নম্বরের বাবুটা খুব ইমানদার রে। বউ বুড়ি, পাগলী, কত দেখ ভাল করে।

—খুব ভালো লোক।

—এই তো নিয়ম। নয়টা শয়তান থাকবে, একটা সাধু। তাতেই দুনিয়া চলছে।

—হ্যাঁ দাদা।

—জনি আর তালার খবর কি ?

—কি জানে!

—বহোত পেয়ারা জোড়ি।

—দুনিয়াতে কত রকম!

বেরিয়ে এসে মহসীন প্রায় ছোটে। নিজের ঘরটির কাছ দিয়েও যায় না। বস্তি এখন গোলকধাঁধা। যে চেনে না সে যেতে পারবে না। প্রতি মোড়। প্রতি ল্যাম্প পোষ্ট। বিরল এককটি শীর্ণ গাছ, ওই নর্দমা ওই ডোবা, কত না ঘটনার নীরব সাক্ষী। কত লাশ, কত লড়াই, কত বার সাইরেন বাজিয়ে পুলিশের গাড়ি ঢোকা ও থেমে যাওয়া। খোঁড়া ডাক্তারের দোকান বন্ধ।

—আরে লালটু, ডাক্তার কোথায়, ল্যাংড়া ?

—কে জানে।

—জনি আর তালাকে দেখেছিস ?

—সিনিমায় গেল।

—কখন ?

—নাইটে।

যমুনার ঘর তালা বন্ধ। পাশের ঘরে আলো। ওখানে গোলামের মা থাকে।

—অ চাচী!

—কে, মহসীন ?

—হ্যাঁ গো।

—তা, এখন ?

—যমুনার খবর জানো ?

—না বাছা। কেন, কাজে যায় নি ?

—না। অসুখ হল কি না···

—অসুখ কিসের ? যা হবার তাই হয়েছে মনে করি। মাগী সকালে বমি করে করে···তখনি বুঝেছি।

—আজ দেখ নি ?

—না না। আমি তো ঘরেই

—জনি আর তালার সঙ্গে যায় নি ?

—না না। গেলাম, জনি, তালা, সব সিনিমায় গেল নাইটে।

—যমুনার···বর তো আসে নি ?

—না না। সে আর আসে ? যমুনা বলে তার জন্যে হেদোয়। আসার হলে আসত।

—আশ্চর্য! কাজেও যায় নি···

নিশ্বাস ফেলে বুড়ি বলে, হয়তো সেও ভেগেছে কারো সঙ্গে। জোয়ান মেয়ে, কদিন শুকোবে ?

—না না, তেমন মেয়ে ও নয়।

—দেখ, কাঁটা খসাতে কোথাও ······

মহসীন ভাবতে ভাবতে ফেরে ঘরে। ঘরে ফেরে নি, ওর স্বামী আসে নি,

বুড়ি যা বলছে…

না, কাপ্তেনকে বলতে হয়।

বলবে? বললে যদি…

বাড়ি ফিরে মহসীন দেখে, লেখক পায়চারি করছেন। মহসীনের মুখ দেখে থেমে যান।

—দেখা পেলে না?

—না বাবু।

—বাড়িতে নেই?

—না।

—কেউ কিছু জানে না?

—না।

—ওর স্বামী আসে নি?

—না বাবু।

—কি করবে বলো তো?

—কি যে করি!

—পুলিশে খবর দেবে?

—না বাবু পুলিশ কি বলবে?

—ওর বাপ মা নেই?

—না না, কেউ নেই। আপনি শুয়ে যান বাবু। যা হয় হবে।

অভ্যাসের বশে মহসীন প্রতি ঘর বন্ধ করে, জানলা দরজা। রান্নাঘরে বাসনকোসন দেখে নেয়।

তারপর আলো নিভিয়ে খাবার ঘরের মেঝেতে শুয়ে পড়ে।

মন পড়ে থাকে খিড়কির করিডোরের দিকে। ওই করিডোর ধরেই যমুনা কাল চলে গেল।

বমি! খোঁড়া ডাক্তারের ওষুধ! হ্যাঁ, যমুনা বাবুর বউয়ের নাইলন শাড়ি পরছিল বটে খুব।

একদিন মহসীনকে বোতলও খাওয়াল।

স্বামীর জন্যেও বসে থাকে, মহসীনের সঙ্গে ভাব রাখে, আবার ওই বাবুটা!

খুব দোনম্বরী বাবু! খুব জালি কাজে থাকে। নইলে সিকিউরিটি রাখে পয়সা দিয়ে?

ওঃ, কাপ্তানের যা রাগ কয়েক ঘরের ওপর। আমরা থাকতে গার্ড রাখা? আমাদের ওপর ভরসা নেই?

গার্ডটা তো ঘুমোয় বসে বসে।

বাবুর ফুর্তি কত! বউয়ের ছেলে হবে, ব্যবসা বাড়ছে, ঝি দেখলেই বাবুর···

যমুনা কাজ করতো তো তার ঘরে।

সাতনম্বর, অর্জুনবাবু, এই এগারো নম্বর আর উনিশ নম্বর।

উনিশ নম্বররা আমেরিকা গেছে।

থাকল তিন ঘর।

ভাবতে ভাবতে, ভাবতে ভাবতে, মহসীন ঘুমিয়ে পড়ে। ঘুমের মধ্যেও অস্বস্তি।

বাবুর বাড়ি ঢুকে গেল, উপে গেল নাকি?

এ কি জীন পরীর গল্প?

এ বাড়ির ইতিহাসও তো ভালো নয়। রহস্যজনক ভাবে ঝিয়ের মৃত্যু আগেও ঘটেছে।

এ বাবু বলছে পুলিশ!

আরে, পুলিশে-বড়লোকে সম্পর্ক কেমন? মিঞা আর বিবি যেমন! বাখর না হলে মদ হয় না। পুলিশ না হলে এদের চলে না।

আগে আগে যে সব ঝি মরেছে, কার বেলা কি তদন্ত হয়েছে?

একুশ নম্বরের বাবু তো···

সে সব সময়ে মহসীনের এমন মনে হয় নি কেন? অবশ্যই ওরা বলাবলি করেছে নিজেরা, যা হবার তাই হয়েছে, আর কি?

কাপ্তেন বলেছে, আরে! পুলিশ সবসময় টাকা খায় চোর ডাকু-মামলার—বস-মস্তানের কাছে। টাকা খাইয়ে দাও। পুলিশ নিজের মায়ের খুনও চেপে দেবে। কোথায় কোন্ ঝি মরল, পুলিশের কি?

মরার কথা ভাবছে কেন যমুনার কথা ভাবতে গিয়ে?

ঘুমের মধ্যেই কেঁপে ওঠে মহসীন।

এবং ওর চোখের পাতায় এসে বসে যমুনা। ঢলো ঢলো মেয়ে গো, ঢলো ঢলো মেয়ে!

মুখ গোলালো, চোখ টান টান, কপাল ছোট, উলটে বাঁধা চুল পিঠ ঝাঁপানো।

এই বুক। এই নিতম্ব, কোমর ধরো এক হাতে। হেঁটে যায় যেন ভরা কলসি উছলে পড়ছে।

যমুনা বলে, বলি অ ঢ্যামনা! অ মহসীন! খুঁজে খুঁজে মরছ কেন? খুঁজে খুঁজে মরি, যে পায় তারই!

—তুই কোথায়?

—মরণ! ঢং দেখ! ঢং দেখার সময় নেই বাবু, চললাম আমি···

বলে, কিন্তু সরে না যমুনা।

মহসীন হাত বাড়ায়, হাত বাতাস খামচায়, গলগল করে ঘেমে ও উঠে বসে।

কি হ'ল? স্বপ্ন দেখল? গলায় তাবিজটা ছোঁয় মহসীন।

উঠব, মুখে চোখে জল দেব, জল খাব। কিন্তু হাত পা যেন ভারি, অসাড়।

উঠব, দরজা খুলব, কেন খুলব?

হাত পা সরছে না, নড়ছে না কেন? যমুনার স্বপ্ন ও দেখে, যে স্বপ্ন যমুনা এমন বাস্তব নয় কোনদিন।

তাবিজ ধরে ও ওঠে। আস্তে রান্নাঘরের দোর খোলে। মুখে চোখে জল দেয়।

রাত তো অনেক। দেড়টা।···জল খায় মহসীন। তারপর দরজা খোলে।



মহসীন যখন দরজা খোলে, দেশাই নিজের ঘরের দরজা নিঃশব্দে বন্ধ করেন। ঘাম হচ্ছে দরদরিয়ে, ভীষণ ঘাম হচ্ছে।

যমুনাকে পলিথিন চাদরে মুড়ে রেখে আসেন নি, সেটা তো নজীর হয়ে থাকত নির্ঘাত।

বুক থেকে পা পলিথিনে মুড়ে টেনে টেনে, টেনে টেনে, দশ ফুট পেরোতে দশ লক্ষ বছর সময় লেগেছিল, দেশাই দশ লক্ষ বছর বুড়িয়েও গেলেন। দুহাতে রুমাল জড়িয়ে নেন। হাত তো যমুনার দেহে বসে যাচ্ছিল। তবু যা হোক, এয়ারকুলার আর পাখা থাকায় কাজ দিয়েছিল খানিক।

কোথা থেকে শক্তি পেলেন ?···কেমন করে ওকে টেনে টেনে নিলেন ?

মহসীনের করিডোরে কয়েকটা রবার গাছ, কয়েকটা পাতাবাহার। সেখানে ওকে রেখে পলিথিনের চাদর খুলে নেয়া।

পা টিপে টিপে নিজের বাথরুমে ঢুকে পলিথিনের চাদর ভীষণ ঘেন্নায়, ভয়ে বাথটবে ছুঁড়ে ফেলা।

তারপর আস্তে, ঘরমোছার ডাণ্ডা-সোয়াপ দিয়ে জলমোছা করা করি-ডোরের মুখ থেকে ওঁর বাথরুম অবধি।

আবার দরজা বন্ধ। এবার দরজা লক।

গেস্টরুমের জানলাগুলো খুলে দেন দেশাই। এয়ারকুলার বন্ধ, শুধু পাখা চলুক। মেঝে ফিনাইলে মোছেন। গন্ধ, যমুনার গন্ধ, চলে যাক, মিলিয়ে

যাক। ওডোনিল ছেটাতে থাকেন ঘরে।

বাথটবে সাবানজলে ভেজান পলিথিনের সীট। এবার এ বাথরুমেই স্নান করতে হবে। পলিথিনটা ধুয়ে দেবেন ভালো করে। স্নান করে পাজামা গেঞ্জি কেচে এ বাথরুমেই মেলবেন।

স—ব সারতে থাকেন, কান সজাগ সতর্ক রাখেন ওদিকে। মহসীনের ঘর থেকে কোনো সাড়া পান কি, না পান। না, সব চুপচাপ। দেশাই পেলেন বাথটবে যমুনাকে। সরালেন মহসীনের ঘরে। মহসীন যদি দেখে, ওকেও সরাতে হবে। যদি না দেখে, তবে তো বিপদে পড়বে। ইলাকে বাঁচাবার জন্যে আর কোন্ পথ ছিল? আর, ইলা কি খাইয়ে ওকে মারতে পারে তাও যেমন সন্দেহজনক, ইলা প্রথমেই "আমিই মেরেছি" বলবে, তাও সত্যি। কি ভাবে মেরেছে সেই গল্পটি উন্মাদের ধূর্ততায় ও খুব সুন্দরভাবে বলবে।

বুঝলাম যে কেস চললে, তদন্ত হলে, হয়তো প্রমাণ হবে একদিন যে এ কাজ ইলা করেছে কিংবা করে নি।

কিন্তু ওই পাবলিসিটি?···কেস উঠলেই যে পাবলিসিটি?

না, আর কোন ঝুঁকি নেবেন না দেশাই। ইলাকে এতদিন বাঁচিয়ে এসেছেন, আজও বাঁচাবেন। ইলা যাবে দেশপাণ্ডের মেণ্টাল হোমে। এ বাড়ি বেচবেন, ব্যবসা গোটাবেন। বোম্বেতে একটা থাকার জায়গা খুঁজবেন। ছেলেকে চেনা আছে, সে ক'দিন মাকে দেখতে যাবে?

সব ফেলে যেতে হবে। বাড়ি, আসবাব, দোলনা, সাজানো রান্নাঘর। আপাতত সকাল হলেই ইলার জন্যে এখানে ডাক্তারকে ফোন করবেন। থাকুক, ডাক্তার গুপ্তের নার্সিংহোমে ক'দিন থাকুক। তার মধ্যে সব ব্যবস্থা করে ফেলবেন দেশাই।

ইলার সামনে দাঁড়ান। একবার ইউরিনাল দিয়েছেন, একবার হরলিক্স খাইয়েছেন। মুখ হাঁ করে নাক ডেকে ঘুমোচ্ছে।

আজ কি ভাবা যায় যে একদিন এই ইলা হেঁটে গেলে চোখ তুলে দেখতে

হ'তো ?

দীর্ঘকাল বাদে দেশাই কামপোজ খান। পা মুড়ে শুয়ে পড়েন দোলনায়। পাখা চলে, এয়ারকুলার, দোলনা দোলে। এর পরেও যদি ব্যুমেরাং হয়, তাহলে বলতেই হবে সত্য ঘটনা। তারপর যা হয় হবে।

ঘুম এসো, ঘুম এসো, ঘুম···

ঘুম আসে না।

ইলাকে নিয়েই তাঁর জীবন। বাকি জীবনটা কাকে নিয়ে থাকবেন ?

কে বলে দেবে, কে ? ··দোলনা অল্প অল্প দোলে।

অর্জুনবাবুর হিসেবে তখন সন্ধে রাত। কিন্তু বন্ধুরা ওঁকে টেনে তোলে।

—এই! বাড়ি যেতে হবে।

—এই সন্ধেয় বাড়ি ?

—রাত দুটো বাজে।

—ধুস!

—আর নয়, বাড়ি চলো।

—ধুস! বাড়িতে কুঙ্কুম নেই।

—বাড়ি চলো, বাড়ি চলো।

ওঁকে টেনে তুলতে হয়। কয়েকজন মাতাল আরেকটি আরো মাতালকে টেনে তোলা সোজা নয়। বন্ধুরা সেই দুঃসাধ্য কাজটি করতে থাকে।

কুঙ্কুম! কুঙ্কুম!

আজ কুঙ্কুমের কাছে গেলেন। অবশ্য কেষ্টকালীর কাছে আগে গেছলেন। তার কি জেরা!

—বলো কি, এমনি এমনি হয়ে গেল ?

—তাই তো বলল ?

—না কি, জড়িবুটি খাইয়েছ ?

—না হে, না।

—দেখ !

—খুঁতখুঁত করছ কেন ?

—ওষুধ-বিষুধে সামান্য···ধরো ইয়ে হ'ল, কিন্তু গর্ভ থেকে যেতেই পারে।

—না, তা বোধহয় নয়।

—তুমিই বোঝো। তবে এরপর আর আমার কাছে ছুটে এসো না।

—আর দরকার হবে না।

—না হলেই ভালো।

—কুঙ্কুমের কাছে যাচ্ছি।

—সকালে ?

—যাই, যা আবদার করে!

সত্যি, কুঙ্কুম আজ যা করেছে সে একেবারে চূড়ান্ত বাড়াবাড়ি। যেন কুঙ্কুম একটি মল্লিকা বন ! এবং সে বনে প্রথম কলি ধরেছে।

—আমাকে আজ নিয়ে চলো।

—কোথায় ?

—আমার বাড়িতে। শুধু একদিন থাকব।

—আমার কাজ নেই ?

—কাজে বেরোও, পৌঁছে দাও ?

—পাগলামি কোর না তো !

—আমার যে বড্ড ইচ্ছে করছে।

—ইচ্ছে কি আমার করে না ?

এখন অর্জুনবাবু তোড়ে মিথ্যের পর মিথ্যে বলে যান। আজ তিনি যমুনার ভারমুক্ত, আজ রাতে মাতাল হবেন, ফুর্তি করবেন, কুঙ্কুমের ন্যাকামিতে ফেঁসে গেলে সবই নষ্ট হবে।

—তুমি নেই, বাড়িতে যেতে ইচ্ছেই করে না।

—একদিন যাই চলো।

—আরে ! এখানে আদর, যত্ন, সর্বদা নজর রাখছেন মা। ও বাড়ি কি

বাড়ি আছে?

—তাহলে ওরা ঠিকমতো কাজ করছে না?

—একদিন করে, তিনদিন করে না। গিন্নি না থাকলে বাড়ি চলে?

—যমুনাও করছে না?

—যমুনা আজ এলই না।

—এত দিই ওকে, তাতেও···

—মোহিনী যা রাঁধছে সব অখাদ্য।

—বাহাদুর?

—বাহাদুর ঠিক আছে।

—আমি একে একে সব ছাড়াব।

—নিজে কাজ করবে নাকি?

—নতুন লোক আনব।

—পারবে না। তোমার কোলে কৌশিক থাকবে। তুমি আনবে লোক?

—কৌশিক নয়, অমেয়।

—না। কুঙ্কুমের ছেলে কৌশিক।

—অর্জুনের ছেলে অমেয়।

—তবে অর্কদেব নাম হবে।

—না, শুনতে কেমন বিশ্রি।

—বুঝতে পারছি, আল্লাদে বাঁদর করবে ছেলেকে। এখন থেকেই তুমি যা করছ।

—আল্লাদ দেবে তুমি!

—কুঙ্কুম! তোমাকে তো দশ বছর ধরেই আল্লাদ দিচ্ছি। তুমি কি বাঁদর হয়েছ?

কুঙ্কুম যেন গলে যায়। আল্লাদী পুতুলের ঢঙে শরবত খায়। তারপর আবার বায়না ধরে।

—তুমি না নিয়ে যাও, বাপী আমায় ঠিক পৌঁছে দেবে। দেবে না বাপী?

জজসায়েব বলেন, পৌঁছে আমি দেব না। তবে যদি খুব লক্ষ্মী হয়ে থাকো একদিন ঘুরিয়ে আনব।

পাশের ঘরে এসে অর্জুন বলেন, সত্যিই নিয়ে যাবেন না কি?

—না। তবে মুখের ওপর "না" বলব না। এ সময়ে ওর মনে কোনো আঘাত দেয়া···

—বাচ্চা হয়ে গেছে নিজে।

—একেবারে। যেন সেই ছোট্ট মিম!

ছোট্ট মিম! ঘোড়ার ডিম! পঁয়ত্রিশ বছরের পোঁটলা, তাতে আটমাস সম্ভাবনা···মিম!

—কি যে ছেলেমানুষী করে!

—খুব। দেখ, বিবাহবার্ষিকীটা কোর।

—আপনিও বলছেন?

—আমরা সবাই বলছি।

রুণুঝুনু বলেন, বাড়ির কথাটাও ভেবো। ওদের শৈশব কেটেছে বড় বড় বাড়িতে···

অর্জুন বলতে যাচ্ছিলেন, বাড়ির কোনো দরকার হবে না। ফ্ল্যাট যথেষ্ট বড়ো। আমি নিজে হামা টেনে দেখেছি যথেষ্ট জায়গা।

বলেন না।

হামা টানার ফলেই যমুনাকে দেখেন।

তারপর···তারপর···

—দেখব, বাড়ির খবর করব।

দেশাই যদি নিয়মিত অপরাধসাহিত্য পড়তেন, তাহলে তাঁর কাছে সমগ্র ব্যাপারটা এমন গোলকধাঁধা হতো না। হেডলি চেজ যারা পড়ে, তারা এমন বিভ্রান্ত হতো না। অবশ্য নিজের বাথটবে নিহত যমুনাকে কে বা চায়!

চোখ বুজে উনি শুধু বলেন, ক্ষমা করো। ক্ষমা করো মহসীন, ক্ষমা করো।...এমন কাজ আমি আগে করি নি।

কেননা এর আগে ইলা যমুনাকে খুন করে নি। ইলা যমুনাকে রাখে নি বাথটবে। তাই যমুনার মৃতদেহ তোমার ঘাড়ে চাপাই নি আমি।

ইলা একবারে যদি ক্ষান্ত না হয়, যদি আবার কিছু করে বসে?

আপাতত ওকে সরিত গুপ্তের নার্সিংহোমে ঢোকানো যাক। তারপর বম্বেতে নেব।

ছেলে তো বলবেই, সব সময় মা মা কোর না বাবা। মা এখন মা নেই। অন্য মানুষ হয়ে গেছে। তোমাকেও অবিশ্বাস করে।

এ সব কথা বলা সোজা সুকেশ। কাজে করা সোজা নয়।

মা বাঁচল বা মরল তাতে তোমার কি বলো? তোমাকে খুব ভালো এডুকেশন দিলাম। বিদেশে গেলে, মেম বিয়ে করলে, বম্বেতে তুমি নিজের জীবন গড়ে নিয়েছ, ছেলে-মেয়ে আছে। মা-বাবাকে বাদ দিয়েই তোমার চমৎকার চলে যাবে।

সুচেতনা পড়ল, পড়া শেষ করল। বাড়িতে বছর দুই থাকল। শাশুড়ি ওকে পছন্দ করে একমাত্র সন্তানের সঙ্গে বিয়ে দিলেন।

আমরা দুজন দুজনকে নিয়ে থাকব বলে জীবনটা সে ভাবে সাজালাম। তোমার মা অনেক কাজে মেতে থাকেন, আমিও কাজ করি। কিন্তু দুজনে একসঙ্গে বেড়াই, খাই, টেলিভিশন দেখি, কি সুন্দর জীবন!

তোমার মা বলত, আমাদের মতো সুখ কারো হয় না।

সুখীই তো ছিলাম। রোজ ভগবানকে ধন্যবাদ জানাতাম। বারবার জানিয়েছি।

ভোরে, ট্রাঙ্ককলে, তুমি সুচেতনার খবরটা দেবে সেদিন কি জানি?

তারপরেও দুজনে দুজনকে নিয়ে·· দুজনে দুজনকে নিয়ে·· কেমন করে জানব ইলা পাগল হয়ে যাবে?

এখন ইলাকে মনে হয় বিশ্বাসঘাতক। "খুন করব" বলা এক কথা, খুন

করা আরেক কথা। কি খাওয়ালে ইলা ? কোথা থেকে পেলে ? এ যা অঞ্চল, পয়সা দিলে সব পাওয়া যায়। আত্মহত্যা করবে ভেবেছিলে ? তবে তাই করলে না কেন ? তুমি বাঁচতে, আমি বাঁচতাম।

যাও, কাল সরিতের নার্সিংহোমে যাও, আমি সব খুঁজে দেখব।

এ সব ভাবছেন, ঢুলছেন, ভাবছেন, ঢুলছেন। এমন সময়ে গেটের কাছ থেকে একটা ফুর্তিবাজ গান ভেসে এল, মাতালের গলায়।

—"এ দুনিয়ায় ভাই সবই হয়

সব সত্যি

স—ব সত্যি।"

অর্জুনবাবুর গলা।

"বর্ণমালা" নামটি জ্বলছে নিয়নে।

আলোর বৃত্তের বাইরে বসে অর্জুন গান গাইছেন জড়ানো গলায়, এ দুনিয়ায় ভাই সবই হয়, সব সত্যি! সব সত্যি! অত্যন্ত প্রমত্ত কণ্ঠ। সুখী, সুখী লোক। গান গাইছে।

বস্তুত অর্জুন বহুক্ষণ ধরেই গানটা খুঁজছিলেন। শ্বশুরবাড়ি থেকে ম্যাণ্ডোলানা, ম্যাণ্ডোলী —না!

কাপুর, ঘোষ, দত্ত, মালহোত্রা, সবাই জুটতে ফুর্তি খুব জমেছিল।

কাপুর বঙ্গোপসাগর পান করলেও বেহেড হয় না। গোপন রহস্য, ভিটামিন বি, মাখন খাওয়া। পেটে চমৎকার লাইনিং তৈরী করো, তারপর খাও না কেন কত খাবে।

কাপুর গাড়ি থেকে মুখ বের করে। —এই বাড়ি যাও।

—তুমি কোথায় যাচ্ছ ?

—হাওয়া খেয়ে তবে বাড়ি যাব।

—আমি ? আমাকে রেখে যেও না।

—বেশ! এসো! ঠিক একঘণ্টা। তারপর ফিরবে।

দরোয়ান বলে, বাবু ভেতরে যাবেন না ?
দরোয়ানের দাড়ি ধরে অর্জুন চুমো খান। বলেন, রাত এখনো তরুণী হে। রাতের যৌবন আসুক, যৌবন ঢলে পড়ুক, তখন ফিরব।
কাপুর ওঁকে টেনে গাড়িতে ঢোকায়।
দত্ত বলে, পয়েট্রি করছ ?
—নিশ্চয়। শুনবে ?
—গানটা গেও না।
—কেন গাইব না ?
গাড়ি ছেড়ে দেয়। এমন রাতে এমন এলাকা দিয়ে হাওয়া খাবার কথা কাপুর ভাবতে পারেন !
অতবড় পুলিশ অফিসার, সাহস কত ? কাপুর বলে, রাত না হলে কলকাতায় নির্মল বাতাস কোথায় পাচ্ছ ?
—কলকাতা একটা মুড়ঞ্চে বেশ্যা !
—কলকাতা একটা রহস্য !
—কলকাতা, কলকাতাই।
—সেই গানটা হোক ! কলকাতা ! কলকাতা ! কে তোমায় বলে ছাতা-মাথা ?
কাপুর বলে, আস্তে। এ এলাকায় নয়।
কয়েকটি মাতাল। ড্রাইভার পাথর-পাথর মুখে গাড়ি চালায়। নিরুপায় সে। প্রতিটি আরোহীকে নামাতে নামাতে ভোর হবে।
ঘুমোতে না ঘুমোতে সকাল ন-টা বাজবে। এবং কাপুর ঝকঝকে ইউনিফর্মে নামবে ঠিক সাড়ে ন-টায়। লোকটাকে কাটলে-কুটলে দেখা যাবে সবটাই নানারকম যন্ত্রপাতি, রক্তমাংস নেই।
অর্জুনবাবুকে ড্রাইভারের পছন্দ। একটি বড় পাত্তি উনি যখন তখন দিয়ে থাকেন।
কয়েকটি বিভিন্ন ডিগ্রির মাতাল। ঠাণ্ডা মাথা ড্রাইভার। ঝকঝকে গাড়িটা

দূষণ মুক্ত বাতাসের লোভে ময়দানে চক্কর মারে।

দরজা খুলে মহসীন যমুনাকে দেখার পর প্রথমটা বমি করেছিল গাছের টবে।…তারপর কিছুক্ষণ কেটেছে।

অন্ধকারপ্রায় করিডোর, কয়েকটি রবার গাছের টব। যে গাছগুলো তেমন ওৎরায় না সামনের ব্যালকনিতে, তারাই হয় নির্বাসিত।

গন্ধ, পেটফোলা। খুনের পর লাশ জলে ফেললে সবসময়ে পেট চিরে দেয়া নিয়ম। নইলে পেট ফুলবে, লাস ভাসবে।

এ যমুনা স্বপ্নের যমুনা নয়, তবু যমুনা। মহসীনের মহব্বত চাপা পড়ে। বিপদের কথা মনে হয়। এবং ক্রোধ, ভীষণ ক্রোধ।

'পহলে ফাঁসা দি'…

'অউর মার দি'…

অউর মেরা হাঁথমেঁ হাঁথকড়া লাগানে কা…

তামাক কোম্পানির গেস্ট হাউসের মহব্বত জর্জরিত মহসীন নির্বাসনে যায়। ডকের একদা সৈনিক মহসীন বর্তমান মহসীনকে গিলে সুপারম্যান হয়। এই মহসীনের প্রতি লোমকূপে ধূর্ততা, নিষ্ঠুরতা, দক্ষতা।

কে চায় কাপ্তান সিংকে ?

যমুনার ভসভসে বুকে হাত চালিয়ে ও রুমাল বের করে।

হায়! ওর বুক স্বপ্নে কি নিটোল ছিল!

রুমালে বাঁধা চাবি, পয়সা, একটি একানে চাবি।

হাঁ বাবু! তুমি সব সময়ে ওর কাছে চাবি রাখতে। চাবি না রাখলেও কি এসে যায়? মহসীনের কাছে তোমার দরজা খোলা বাঁ হাতের খেলা!

হাঁ হাঁ বাবু! তোমার বউয়ের ছেলে হবে। ফূর্তি করবে, মিঠাই বিলাবে, বহোত খুশিয়ালি হবে।…যমুনা মায়ের ভোগে যাবে।

কেন বাবু? বউয়ের পেটে তোমার ছেলে, ঝিয়ের পেটেও তোমার ছেলে,

তুমি সামলাও। মহসীনদের হিসাবে অত দয়ামায়া নেই।

যমুনা, যমুনা! বাবু কি তোকে বউয়ের বিছানায় কোনোদিন তুলেছিল? মহসীন তোকে তুলবে। পেট গ্যাসে ফোলা গো, যেন পূর্ণগর্ভা।

চল্ যমুনা বাসর ঘরে।

টানতে টানতে···টানতে টানতে···বাথরুমে, গেস্টরুম, বেডরুম। কি বিছানা রে! কোঁচকানো সাটিনের ঢাকা, সাটিনের বালিশ, কি কারবার। ভোঁচকি ভঁয়সী হয়ে গেলি যমুনা!

ওঠ বিছানায়। দাঁড়া, যত এসেন্স আছে ঢেলে দি। চাদরে ঢেকে দি। বা, যমুনা বা!

পেট উঁচিয়ে পড়ে থাক, বিচার পাবি।

তুই বিচার পেলে বাবুরা খানিক ডরাবে।

ঝি-গুলো খানিক বাঁচবে।

এ হল ডক ও বন্দর এলাকার, কলকাতার অন্ধকার পাতাল জগতের বিচার।

সে বিচারে জজ নেই, হাইকোর্ট নেই, সুপ্রীম কোর্ট নেই। নেই আইনের নামে টিকরমবাজি।

মহসীন রুমাল দিয়ে দরজা মোছে। বাথরুমের মেছেতে যমুনার রসলালা থাকুক। থাকুক দরজার বাইরে।

মহসীন নিজের করিডোরটি ফিনাইলে মোছে। চাবিটা যমুনার পাশে। এবার স্নান করে ফেলি।

ওর স্নানের শব্দ শুনে লেখক বেরিয়ে আসেন অবাক হয়ে।

—স্নান করছ?

—হ্যাঁ বাবু, গরম লেগে গেল। ঘুম না এলে গরম লেগে যায়। মহসীন হাসে।

—আপনি শুয়ে যান বাবু।

—তিনটে বাজে! শুয়ে কি হবে? কফি বানাও, দুজনে খাই।

—বানাই।

—বারান্দাটা খুলব?

—খুলে দিচ্ছি দরজা।

—এখানে বসে থাকলে সূর্য ওঠা দেখা যায়, তাই না?

—দেখা যায় না, বোঝা যায়।

—কি ঠাণ্ডা!

—এত উঁচু বাড়ি!

—গাছগুলো আছে বলে···

—কফি করি বাবু।

লেখক বসেন। না। মহসীনের মনের মেঘটা কেটে গেছে। ভালো। লোকটা বেশ। বন্ধুকে বলবেন। মহসীন ও যমুনা! এই তো পূজা সংখ্যার একটা লেখা হয়ে যায়।

মহসীনকে ও যমুনাকে অন্য পরিবেশে নিয়ে ফেলতে হবে। চটকল, রেলইয়ার্ড, সুন্দরবন, পরিণামে জীবন জয়ী হবে।

খারাপ নয়, খারাপ নয়, আসলে সব কিছুই লেখার বিষয়বস্তু হতে পারে। কফির সুরভি, বেনসন হেজেসের প্যাকেট, রাত শেষ হবার ঘণ্টা খানেক আগে, আকাশটা কি আশ্চর্য না দেখায়। আকাশ বা কতরকম দেখলেন, কত জায়গায়।

হঠাৎ, ওঁর কানে ভাসে পুরনো দিনের গান, এই তুনিয়ায় ভাই সবই হয় সব সত্যি!

আ, ছবি বিশ্বাস! কবেকার ছবি, কবেকার ছবি! বর্ণমালায় এ গান, কে গায়?

মহসীন বলে, অর্জুনবাবু!

—এত রাতে তো কখনো···

—মাঝে মাঝে হয়ে যায় বাবু।

—তা তো হবেই।

অর্জুনকে লিফটে ঢোকায় দরোয়ান, তুলে দিয়ে যায়।

—ওঃ, আমি পারব, পারব। কি ভাবছ ? খুব পারব। মাতাল হই নি হে! দেখ! দরজার সামনে সিকিউরিটি গার্ড ঘুমোচ্ছে। এই তো ব্যাপার! মাসে হাজার টাকা দিচ্ছি কোম্পানিকে, গার্ড ঘুমোচ্ছে। কালই জানাতে হবে।

মাথায় মহাবিশ্ব ঘুরছে। অনেক চেষ্টায় দরজা খুলে ভেতরে ঢোকেন, বন্ধ করেন।

সব ঘুরছে। মাথা এখন সোলারিস। পা টিপে টিপে বেডরুমে ঢুকে, এ কি দৃশ্য!

কুঙ্কুম! কুঙ্কুম! ঠিক চলে এসেছ ? মাথা মুখ ঢেকে ঘুমোচ্ছে ? এয়ার কণ্ডিশনার চালাও নি কেন ? ঠাণ্ডায় ঘুমোতে যে তুমি ভালোবাসো—চালিয়ে দিই।

না কুঙ্কুম! সকালেই তোমাকে ও বাড়ি যেতে হবে।

এ সময়ে এখানে থাকাটা ··

সব ঘুরছে, ঘুরছে।

কি জেদী মেয়ে রে বাবা!

অর্জুন বিছানার এই প্রান্তে শুয়ে পড়েন। শুতে না শুতেই ঘুম। ভারি এসেন্সের গন্ধ, অন্য কোনো গন্ধ, ওঁকে এতটুকু বিরক্ত করে না। ঘুমে তলিয়ে যেতে যেতে মনে হয়। আট মাস না ন' মাস ? পেট এত উঁচু কেন ? অমেয়, কৌশিক, অর্কদেব, কিসকিস, কুসকুস, কিসকিস, কুমকুম, অর্জুন হাঁ করে ঘুমোন।

১০

অনেক, অনেক মদ, শেষে বেপরোয়া মেজাজে একটি ট্যাবলেট খান, ফলে অর্জুন মড়ার মতো ঘুমোতে থাকেন।

মস্ত বিছানার একপাশে যমুনা, এ পাশে উনি। কখন সূর্য ওঠে, কখন বেলা হয়, সব অর্জুনের অজানা থেকে যায়।

বাহাদুর এ বাড়িতে সব চেয়ে আগে কাজে আসে। সে কত ডাকে, কত বার বেল বাজায়, বাবুর সাড়া মেলে না।

মোহিনী আসে বাহাদুরের পরেই।

আবার ডাকাডাকি, আবার বেল বাজে। মোহিনী বলে—এ যে কুম্ভ-কর্ণের ঘুম গো!

বাহাদুর বলে—এমন তো ঘুমোয় না।

লিফটম্যান বলে, আরে! তো ভোর চারটেয় বহোত মাতাল হয়ে বাড়ি এলেন। মদের জন্যে ঘুমোচ্ছেন। ঘুমোবেন না? বাপ রে! কত দারু যে পিয়েছেন তা কেউ জানে না।

মোহিনী বলে, আমি বাইশ নম্বরে যাই। আগে ওখানে কাজ সারি, তবে আসব।

বাহাদুর বলে, মোহিনী! আজ না পেসকণ্টোল আসবে? তখন তো মুশকিল হবে। বাবু বা ওঠে না কেন?

—পেসকণ্টোল তো আমি কি করব? বাহাদুরের বাড়াবাড়ি!

—যমুনা ভি এল না।

—সে আমি জানি ?

—কোত্থেকে বদ্ বু আসছে না ?

—কোথায় ?

—তুই কি জানবি মোহিনী। কাল এত মাছ, এত মাংস খেয়েছিস যে নাক তোর খাবারে বন্ধ আছে।

—মরগে ছোঁড়া। বাবু নিতে বলল, তাই নিলাম।

এমন সময়ে দেশাই ইলাকে জাপটে ধরে বেরিয়ে আসেন। ইলাকে স্নান করিয়েছেন, খাইয়েছেন, চুল আঁচড়ে দিয়েছেন, কাপড় পরিয়ে দিয়েছেন। সবাই চুপ করে যায়।

দেশাই বলে চলেছেন, আমরা বেড়াতে যাচ্ছি ইলা ! দেখবে কত সুন্দর জায়গা। আমরা বেড়াতে যাচ্ছি ইলা, দেখবে কত সুন্দর জায়গা !

—সুন্দর জায়গায় যাচ্ছি ?

—হ্যাঁ ইলা···

সঙ্গে ডাক্তার। ডাক্তার লিফটের দিকে এগিয়ে যান। ইলা আবার দেশাইয়ের দিকে তাকান।

—আমি শাড়ি পরেছি কেন ?

—বা, বেড়াতে যাচ্ছি যে !

—কবে ফিরব গো !

—খুব···তাড়াতাড়ি···

দেশাইয়ের চোখ দিয়ে জল নামে। তবু উনি বলে চলেন, সেখানে কত ফুল···কত পাখি···কত ভালো লাগবে তোমার···

লিফটে ঢুকে যান ওঁরা। দেশাইয়ের কাঁধে একটা ব্যাগ। ওঁর চোখ দিয়ে নিঃসংকোচ জল নামছে।

মোহিনী হাত জোড় করে কপালে ঠেকায়।

—দেখলেও পুণ্যি, দেখলেও পুণ্যি। পাগলী কত জন্ম তপিস্যে করে

সোয়ামি পেয়েছিল গো! সোয়ামি যে বউয়ের এত ঝামালি মাথায় নেয়, কে কবে দেখেছে? কোনো মদ খায় না, মেয়েছেলের লালচ করে না, বউ, বউ, আর বউ! জীবনটা দিয়ে দিল।

জমাদার আন্তরিক দুঃখে বলে, মেমসায়েবকে তো এখানে রাখবে না। বোম্বাইতে হাসপাতালে দিয়ে দেবে। তারপর সায়েব কি আর এখানে থাকবে, একা একা?

—যাবে বা কোথায়?

—ছেলের কাছে যাবে, বোম্বাই।

—একটা মেয়ে সেও মরে গেল। সায়েব ভালো লোক তো! দুঃখ পেতে এসেছিল।

মোহিনী বলে, দুজনেই ভালো গো! পাগলী হলেও মনটা দরাজ কত! কিন্তু এ ঘরে হল কি? বাবু যে মোটে দোর খোলে না।

বাহাদুর বলে, যমুনা আজও এল না?

মোহিনী হাতের তালু উলটোয়।

অর্জুনবাবু অকাতরে ঘুমোন। ঘরে এয়ারকণ্ডিশনার চলে, ঠাণ্ডা, ঠাণ্ডা ঘর। ঘুমের অতলে কোনো স্বপ্ন নেই ওঁর, কোনো উদ্বেগ।

বেলা দশটা নাগাদ মহসীন দেখে জমাদার নয় নম্বর বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে।

—কি হ'ল, জমাদার?

—মহসীন!

—কি হল?

—কোনো বদ্ বু পাচ্ছ?

—না তো!

—এ কৈসা তাজ্জব ভাই! সাত নম্বরে কাজ করছিলাম, ওহি নয় নম্বর বাড়ি থেকে বহোৎ বদ্ বু···

—আপিসকে বলো গিয়ে।

—তুমি পাচ্ছ না ?

—না ভাই। গেস্ট আছে, জান তো ? তার ওপর বড় সায়েব আরো গেস্ট আনছে। বহোৎ ঝামেলা। চাইনিজ মাঙাও, বিয়ার মাঙাও, যমুনাও এল না, কামরা সাফ করো, সব ঠিকঠাক রাখো···

মহসীন চলে যায়। জমাদার ভেবে পায় না সে কি করবে। অবশেষে সে আপিসে যায়। যদি কিছু হয়ে থাকে, আপিসে না জানানো তো ঠিক নয়। বাবুরও সাড়া নেই, গন্ধটাও···

গন্ধটা জমাদারের খুব চেনা গন্ধ বলেই ও অবাক হয়েছে বেশি। বাবু ভোরে ফিরল, এর মধ্যে মরেও গেল, পচেও গেল ?

আপিসে, কেয়ারটেকার আপিসের উদয়বাবু ম্যানেজার নন। ম্যানেজার একটু বাইরে গেছেন। উদয়বাবুই জমাদারদের অন্নদাতা।

—উদয়বাবু !

—কি হ'ল, রূপলাল ?

—নয় নম্বর থেকে খুব বদ্ বু আসছে।

—নয় নম্বরে তো কেউ নেই ?

—কেন থাকবে না বাবু ?

—আরে, মিসেস তো বাপের বাড়ি। অর্জুনবাবু কাল সকালেই বলছিলেন যে কয়েকদিনের জন্যে হলদিয়া যাবেন। বাড়িতে থাকবে কে ?

—বাবু তো আজ ভোর চারটায় বহোৎ দারু পিয়ে···দরোয়ান জানবে বাবু।

—তাতে তোমার কি, রূপলাল ? আর, চারটের সময়ে যদি বহোৎ দারু পিয়ে এসে থাকেন···

—দরজা তো খুললেন না। মোহিনী আর বাহাদুর কত বেল বাজাল।

—ঘুমোচ্ছেন নিশ্চয়।

—কিন্তু বদ্ বু···

—সেবার একুশ নম্বরে যা হয়েছিল তেমনি কিছু হয়ে থাকবে। গোটা মাছটা থলিতে রেখে ওরা দিল্লী চলে গেল না? মাছ পচে···শেষে দরজা ভেঙে আমরা বোকা বনলাম।

—বাবু! এ কোই পচা মাছের গন্ধ নয়। যাক গে! আমার ডিউটি, আমি জানিয়ে গেলাম।

—তুমি ও ঘরে কাজ কর?

—চমন করে। সে ছুটিতে তো আমিই করছি। আজ ঢোকাই গেল না।

—দেখছি দেখছি। আবার ফোন বাজে। দাঁড়াও তো। হ্যাঁ, অফিস। হ্যাঁ মিসেস চৌধুরী, প্লাম্বারকে খবর দিয়েছি। এখানে আসবে, হ্যাঁ, আমি নিজে নিয়ে যাব। হ্যাঁ, রাখলাম। রূপলাল!

—বাবু!

—সতেরো নম্বরে প্লাম্বার চাই, তেরো নম্বরে সুইচ খারাপ, আর দশ নম্বরে না কি জল আসছে না, তুমি বলছ, ন' নম্বরে বদ্‌বু···ঠিক আছে, লিখে রাখলাম। ম্যানেজার বাবু আসুন···দেখাই···

—আচ্ছা বাবু!

মহসীন ঢোকে।

—তোমার আবার কি, মহসীন?

—ম্যানেজার সাব যেন একবার যান। বড় সায়েব আসছেন। ঘরের রং পালটাবেন, কথা বলবেন।

—বেশ আছেন তোমার বড় সায়েব। কোম্পানির পয়সায় বছর বছর রং করাচ্ছেন।

—হ্যাঁ বাবু!

—দাঁড়াও, এটাও লিখে রাখি। সব মাথায় রাখা সম্ভব নয়, সত্যি সম্ভব নয়। ন' নম্বরে বদ্ বু···ম্যানেজার বাবু এগারো নম্বরে···দেশাই সায়েব যেন কি বলে গেলেন? ও, ওঁর ঘরের ওপর নজর রাখতে···আর কি যেন, কি যেন···

মহসীন ও রূপলাল বেরিয়ে আসে। মহসীনের মনেএখন শুধু উত্তেজনা, প্রতিহিংসার উত্তেজনা, ন' নম্বরে কখন ঢুকবে সবাই?

যমুনা কাল খুবই ঠাণ্ডা ছিল, খুব। কোথায় কোনো বরফ ঘরে রেখেছিল ওকে কেউ?

মহসীন আবার মনে করে ভালো করে। যমুনার পাশে ওর চাবিটা রেখে এসেছে, এবং ন' নম্বরের প্রতি দরজা বন্ধ করে রেখে এসেছে। ভোর না হতে ওর করিডোর মুছে ঝকঝকে করেছে। এখন মহসীন ব্যস্ত, সত্যিই ব্যস্ত।···বড় সায়েব আসবেন।

সবাই থাকতে থাকতে যদি যমুনার ব্যাপারটা···মহসীন লিফটের সামনে দাঁড়ায়।

উদয়বাবু হেঁকে বলে, রাজার চাকরি তোমার মহসীন! টেলিফোনে ফুল আনাচ্ছ, মদ আনাচ্ছ, খাবার আনাচ্ছ···

—হ্যাঁ বাবু!

মহসীন মনে মনে বলে, তোমরাও তো মেনটেনান্স থেকে টাকা মারছ বাবু!

আচ্ছা, যমুনাদের বস্তি থেকে কেউ খোঁজ করতে এল না? আপনজন না থাকলে যা হয়!

জনি আর তালা বা কি করছে? তারা কি জানে না যে মহসীন খোঁজ করে এসেছে? তারা কেন এল না? গোলামের মা, সেও তো এল না?

যমুনা রে! তুই বলতিস তোর আপনজন সবাই। কেউ নেই রে, কেউ নেই! থাকলে পরে কেউ আসে না?

ভাবিস না যমুনা। তোকে যে সর্বনাশ করেছে, তার ব্যবস্থা আমি ঠিকই করেছি।

স—ব ব্যবস্থা করেছি।

ওদিকে যমুনাদের বস্তিতে জনি আর তালা খুব বিপদে পড়ে যায়।

ওরা আন্দাজ করতে পারে কি হয়েছে, অথচ বলতে পারে না।

গোলমাল বাধায় মলয়, যমুনার বর।

ওর কারখানা খুলেছে। ইউনিয়ন ও মালিক পক্ষ সব মিটমাট করে নিয়েছে। বকেয়া মাইনের খানিক টাকা মলয়রা পেয়েছে। সে টাকা যৎসামান্য। কেন না তিনশো টাকা কিছুই নয়।

তবু মলয় তার কথা রেখেছে। টাকা পেয়েই ও নিতে এসেছে যমুনাকে। যমুনা যদি তাকেই চায়, তবে চলুক বেলেঘাটা। ঘরও দেখেছে মলয়। যমুনার খোঁজ নেই কেন?

—যমুনা ঘরেই নেই?

—দেখতেই পাচ্ছ।

—জানিস না? তোরা জানিস না?

—আমরা কি জানব? ও গেল কাজে। আমরা সিনেমা গেলাম, মাইফেল করলাম, ঘুমোলাম, দেখতেই তো পাচ্ছিস যে চা খাচ্ছি।

—তোরা জানবি না তো কে জানবে?

—মলয়! এতদিন তো আমাদের পোকামাকড় মনে করতিস। আমাদের ওপর তোর কত ঘেন্না ছিল, যমুনাকে বলতিস, ওদের সঙ্গ ছেড়ে দে! আমাদের ওপর এখন যে খুব ভরসা দেখাচ্ছিস! পালা! হাফ ভদ্দর! বউয়ের খোঁজ নাও নি কেন এতদিন? কোথায় ছিলে?

গোলামের মা জল আনছিল। সে কলসি নামিয়ে বলে, কে? মলয় না?

—হ্যাঁ, আমি।

—যমুনার কথা হচ্ছে? সে তো ঘরেই আসে নি, কাজেও যায় নি পরশু বিকেল হতে। মহসীন কাল সকালে খোঁজ করে গেল। তা কাজেও গেল না, ঘরেও এল না, গেল কোথায়?

—পরশু বিকেল হতে কাজে যায় না?

—তাই তো বলল। তা তুমি কোথা ছিলে বাছা? এতদিন ধরে মেয়েটাকে ফেলে রেখে গেছ?

—যমুনা কোথায়, জানেন ?

—আমায় বলে গেছে যে জানব ?

জনি আর তালা এ-ওর দিকে তাকায়। দু'জনে চোখে চোখে কি যেন কথার আদানপ্রদান হয়, মলয় ঠিক বুঝে উঠতে পারে না।

—মলয়, এদিকে আয়, কথা আছে।

—ঘরটা খুলি আগে।

—চাবি আছে ?

—একটা চাবি তো আমাকেই···

ঘরটি যেন কত কথা নিশ্চুপে জানায়। চৌকিতে মাদুর, কলসিতে জল, ঝকঝকে জনতা স্টোভের পাশে উপুড় করে রাখা হাঁড়ি, পাশে চালের টিন, তারের সাজিতে আলু। আলুতে আরশোলা ঘুরছে।

যমুনা বলত, কখন এসে পড়বে, আলু সিদ্ধ ভাত তো দিতে পারব।

জনি বলে, কেমন মেয়ে পেলি, চিনতে পারলি না। বস্তির মেয়ে! তোমার ভদ্দর ঘরে সব সতীলক্ষ্মী। তুমি এলে ভাত চাপাবে বলে সব তৈরি রাখত। কাজে বেরোবে তো গোলামের মাকে চাবি দিয়ে বলে যাবে যে, মাসি! সব আছে ঘরে, চাবি যদি ও হারিয়ে ফেলে, তবু বসতে পাবে। থাকতে বোলো ঘরে।

তালা বলে, একটা ভালোমন্দ পেলে তোর জন্যে বয়ে আনবে।

মলয়ের লুঙ্গি গেঞ্জি সাবান কাচা। মলয় যমুনার বাক্স ভাঙে। জামা, কাপড়, এ কি, এত টাকা!

—এত টাকা ? চৌদ্দ শো ?

—হবে না কেন। চার বাড়ি কাজ, সাড়ে চারশো টাকা পেত। তিরিশ টাকা ঘর ভাড়া। ওর খাওয়াদাওয়া, জামাকাপড়, বাবুদের ওখান থেকেই জুটে যেত।

—পাই পয়সা তো জমাত, তার ভদ্দরলোক সোয়ামি আসবে, দোকান দেবে!

—সব রেখে গেল কোথায় ?

—সেই তো কথা। চা বানা তালা।

তালা চা বানায়। জনি দরজা বন্ধ করে। এখন মলয়কে সব বলতে হবে, শুধু "লপটে টাকা থাকে" বলা চলবে না। হাফ ভদ্দরকে বিশ্বাস করা চলে না। আর ওরা তো কাল যায় নি যমুনার নির্দেশমতো। ওরা তো আঁচ করেছিল কি ঘটেছে।

সিনেমাতেও যায় নি। ল্যাংড়া ডাক্তারকে পেটাচ্ছিল।

ল্যাংড়া নিজেই ছুটে এসেছিল।

—দৌড়া রে তোরা! যমুনাকে কি দিতে কি দিয়েছি, বহোৎ গড়বড় করেছি।

—তার মানে ?

—নেশায় ছিলাম···গড়বড় হয়ে গেল।

—তার মানে মোক্ষম দাওয়াই দিয়েছ ?

—আর কি!

—মরে যাবে ?

—বুঝি মরে গেছে।

—সর্বনাশ!

—যা তোরা!

—গিয়ে কি করব ?

—ওকে হাসপাতালে নিবি।

—কেমন করে ?

—মাগীটা মরে যাবে।

—তুমি বেঁচে থাকবে ভেবেছ ? পালা বদমাশ! আমরা ওই বাড়ি যেয়ে তাকে খুঁজতে পারি ? মাডার কেস না ? থানা জানবে, কর্তা জানবে, আমাদের ঝুলিয়ে দেবে।

—আমাকে কি করবি ?

—ডাক্তারি করা ঘুচিয়ে দেব।

ভীষণ রাগে উন্মত্ত হয়েছিল ওরা। যমুনার জন্যে দুঃখ। "লপটের টাকা" নিয়ে স্বাধীন হওয়া হ'ল না, সেজন্যে হতাশ ক্রোধ।

—তোর হাত ভেঙে দেব, টাকা খিঁচে নেব, এলাকা থেকে বার করে দেব।

—যমুনা মরলে তোরা ...আমাকে...

—আমাদের জীবন খাক করে দিয়েছ শালা! কি ওষুধ দিচ্ছ চেয়ে দেখনি?

ল্যাংড়াকে ওর ঘরে নিয়েই ওরা মেরেছিল, হাত ভেঙেছিল, ওর বাক্স খুলে টাকা নিয়েছিল।

মলয়কে ওরা সব বলে না। খোঁড়া ডাক্তারের ওষুধের কথা চেপে যায়। তবে বাকিটা বলে।

—যমুনার গর্ভ হয়েছিল?

—ওই অর্জুনবাবুর কাজ।

—যমুনার মতো শক্ত মেয়ে!

—মেয়েছেলে তো! কত শক্তি ধরে?

—সেই বাবুর ওখানে গেছে?

—বলেছিল, "যাব।"

—তোরা সত্যি বলছিস?

—সত্য নয় তো কি মিথ্যে?

—ওর গায়ে আমরা কখনো...

—যমুনার সঙ্গে তোর বিয়ে দিল কে?

—তোরাই দিয়েছিলি।

—ও আমাদের জিগরি দোস্ত্।

—যমুনা তাই বলত।

—এ কথা সত্যি যে আগে ও খোঁজ এনেছে, আমরা কাজ করেছি।

—তুমি শালা কি "খাটব খাব" শিখালে তো বিয়ের পর ও খেটেই খেত। আর খোঁজ ভাঁজ আনত না।

—"খেটে খাও" কি খারাপ কথা ?

—তোর সঙ্গে আমাদের মিলবে না কোনোদিন। চিরদিন ঘেন্নাও করলে, যমুনার ভাতও খেলে, ওকেও হাফ ভদ্দর করবে বলে···শালা ! খাটে না কে ? আমাদের কাজে মেহনত নেই ? আমরা খাটি না ?

—হাফ ভদ্দর বোল না।

—কেন বলব না ? যমুনা সাড়ে চারশো কামাত, তুমি নয় পাঁচশো পাবে। ওতে বস্তিতেও চলে না। তুমি আবার ভদ্দরপনা দেখাও !

—গেল কোথায় ?

—কি বলব ? ওর মুখ তো সাংঘাতিক। সাপের মতো বিষ ঢালতে পারে। পরশু যেয়ে অর্জুনবাবুকে সাত সকালে খুব গাল দিয়েছে। বলেছে "তোমার পাপ, তুমিই ব্যবস্থা করবে।" বিকেলে বলে গেল, "বাবু বলেছে ব্যবস্থা করবে, তাই যাচ্ছি। নইলে মণ্ডয় এলে মুখ দেখাব কেমন করে ?"

—অর্জুনবাবুর বাড়িতেই গেল ?

—তাই বলে তো গেল।

—চাবি একটা থাকত···দরজা খুলে ঢুকে কাজকর্ম করত···মনে পড়ছে।

—ওখানেই যাও, তুমি তো স্বামী।

—এক বাড়িতে কাজ তো করত না ?

—কাজ করত চার বাড়ি।

—সেখানেও যাব ?

—যেয়ে লাভ কি ? অর্জুনবাবু, ন' নম্বর ফ্ল্যাট। বউ বাপের বাড়ি গেছে ছেলে হতে, সব যমুনা বলেছে।

—তোরাও চল্।

—আমরা যাব কেন ?

—তোরা তো সাক্ষী।

—আমরা সাক্ষী দেব ? দারোগাবাবু তো হেসে খুন হবে। এ যে হাসির কথা হয়ে গেল মলয় !

—কেন ?

—তোর চোখে আমরা লাফাংগা। দারোগার চোখে আমরা চুনো মস্তান। আমাদের থানায় ঢুকালে, পিটলে কর্তা বাঁচাতে যাবে না।

—একলা যাব ?

—কেনযাবেনা? তুমিসোয়ামি। তোমারজিগ্যেসকরারহক আছে।

—একলা যেতে কেমন···

—বাবুটার শাস্তি দরকার। শালা টাকার কুমীর ! বউ রয়েছে ঘরে। ঝি পেয়ে···

—ও বাড়িতে কেন, ও বিলডিঙে কাজ করতেই আমি নিষেধ করতাম।

— একেই বলে ভদ্দরহারামি। তুমি ফুটো পয়সা আনবে না, ও ঝি খাটবে, তাতেও সোয়ামিগিরি ফলাবে !

তালা খেঁকিয়ে বলে, এ এলাকায় কোন কাজটা আছে? কোকেন বেচবে না, চুল্লু বেচবে না, ঝি খাটবে না, কোন কাজটা করবে ?

—সৎ পথে মেহনত···

—বকোয়াসি কোর না। খোমা পালটে দেব। সৎ পথে মেহনত ! ওরে আমার মোহান্ত রে !

—জানতেই তো কোথায় থাকে, কি করে, কাদের সঙ্গে ওঠাবসা, বিয়ে করলে কেন ? ভেবেছিলে বিয়ে করে ও তোমাকে পার্ক স্ট্রীটে নিয়ে তুলবে ?

—না না, তা নয়। তবে যমুনা যে সবসময়ে বেশী টাকার স্বপ্ন দেখত।

—হাজার বার দেখবে। সাচ্চা মেয়ে, জওয়ানী আওরত। ভাল খাব, ভালো পরব, টেলিভিশন দেখব, ভালো ঘরে থাকব, স্বপ্ন দেখবে—তাতেও তোমার ন্যাকা বজ্জাতি ?

—যাক গে, চলো ভাই···

—ব্যাগ উঠাচ্ছ কেন ? মলয় ?

—মলয় ! যদি ভেবে থাকো যে তোমার বউয়ের জন্যে আমরা ফেঁসে যাব, তুমি সটকে পড়বে, তাহলে তুমি মায়ের পেটে আছ।

—তোমাকে মলয় ! আমরাই মায়ের ভোগে দিয়ে দেব। শালা হারামি।

—ব্যাগ রাখলাম।

—রাখো। ঘর বন্ধ করব আমরা। চাবি রাখব আমরা। তোমাকে বিশ্বাস কি ?

—দেখ দেখ্ জনি ! মলয়ের মুখ দেখ্। শালা ভয়ে মরছে।

—যমুনার জন্যে যাচ্ছি রে। ওর জন্যে তো নয়। চল্ তামাশা দেখি।

"বর্ণমালা" বাড়িতে ওরা যখন ঢোকে, তখন বেলা একটা হবে হবে। মলয় সভয়ে চায়। এ বাড়িতে ও কোনোদিন ঢোকে নি। ঢুকবে বলেও ভাবে নি। যমুনার জন্যে···

কাপ্তান সিং জনি ও তালাকে দেখে চোখ মটকায়, হাসে।

—কী খবর রে ?

—খবর কি আর বলব দাদা ! এদিকে এসো। এ হচ্ছে মলয়।

—মলয় ! কোন্ মলয় ?

—যমুনার বর।

—যমুনার বর ? হে হে, বড়ি তাজ্জব বাত। যমুনাকে জানি, বরকে তো দেখি নি। তা কি চায় যমুনার বর ?

—যমুনাকে খুঁজছে।

—জরুর খুঁজবে। বরের তো হক আছে খোঁজবার। মহসীন খুঁজছে, দেশাই সাব খুঁজছে, একোইশ নম্বর অবশ্য এখানে নেই, লেকিন ন' নম্বরের মোহিনীও বলছে যমুনা আসে নি। সে লেড়কি জরুর এসেছিল পরশু। আমি নিজে দেখেছি তাকে ঢুকতে।

মলয় বলে, ও সকলকে বলে এসেছিল যে ন' নম্বরে যাবে।
—তা তো যাবেই। কাজ করে যে।
—আপনি বুঝতে পারছেন না। তারপর আর ও ঘরে ফেরে নি।
—মহসীন বলল···দাঁড়াও, ম্যানেজারবাবুর ঘরে চলো। ন' নম্বর···
ন' নম্বরের বদ্‌ বু-র কথা ম্যানেজারবাবু জেনেছেন। এখনি কথা হচ্ছিল, গন্ধটা কিসের হতে পারে।
ম্যানেজার ফট করে বলেন, ন' নম্বরের বাবু তো ঘরে নেই।
কাপ্তান বলে, সে কি কথা ? সকাল চারটাতে বাবু বহোৎ পিয়ে ফিরলেন, লিফটম্যানকে শুধান। সকালে মোহিনী, বাহাদুর, কতবার ডাকল না ?
—বিকালে তোমার বউ ন' নম্বরে আসতে পারে না। সে সময়ে বাড়ি খালি ছিল।
কাপ্তান যে কার নিয়োজিত লোক, তা ম্যানেজার জানেন।
কাপ্তান বলে, যমুনার কাছে বরাবর ও বাড়িতে ঢোকার চাবি থাকত।
—সে কি কথা ?
—বাবু দিয়েছিল। মহসীনকে ডাকুন না, সে আরো বলবে।
—মহসীনের ঘরে গিয়ে শুধাও। তার বড়সায়েব আসবেন, সে নামবে কেমন করে ?
—আপনি যাবেন না ?
—তুমিই যাও না।
—না বাবু, আপনি চলুন।
—এরাও যাবে ?
—কেন যাবে না ? যমুনার ধরমভাই লাগে, আমার বহোৎ চিনাজানা লোক। কি রে জনি, বল ?
—আমরা কি বলব দাদা ! সকলকে বলে এল অর্জুনবাবুর ঘরে যাচ্ছি, ন' নম্বরে যাচ্ছি। তারপর···

বাইরে কারা ডাকছে। দরজা ধাক্কাচ্ছে। আশ্চর্য। ধাক্কা দেয়, এমন আস্পর্ধা ! তাঁর বাড়িতে ধাক্কা দেবে ?

মাথা ঝাঁকিয়ে টলতে টলতে তিনি বেরিয়ে আসেন, দরজা খোলেন। গন্ধ এখন সবিক্রমে হাওয়াকে আক্রমণ করছে।

—কি ? কে তোমরা ?

—অর্জুনবাবু, এরা…

—যমুনা কোথায় ?

—কে হে তুমি ?

—যমুনার বর।

—যমুনার বর ? তা আমি কি করে জানব যমুনা কোথায় ? এঃ ! এমন পচা গন্ধ ছি ছি, এত গন্ধ…

ম্যানেজার বলেন, আপনার ফ্ল্যাট থেকে গন্ধ আসছে মশাই। দশটা থেকে রিপোর্ট পাচ্ছি। আপনাকে বেল বাজিয়ে তোলা যাচ্ছে না, সেই জন্যে…

মলয় বলে, ভেতরে যাব।

—ভেতরে যাবে না। আমার বউ আছে ও ঘরে, কেউ যাবে না।

—সবাই যাবে।

কাপ্তান বলে, আমি যাচ্ছি সাব, ম্যানেজারবাবুও যাচ্ছেন।

ম্যানেজার বলেন. এত গন্ধ কিসের ?

অর্জুন বাবু হাঁ করেন, খাবি খান। গন্ধটা তো সত্যি।

—কিসের গন্ধ ম্যানেজার ?

সবাই ঢোকে। গন্ধ এ ঘরে সর্বত্র, গন্ধ শোবার ঘরে।

বেডরুমে ঢোকে ওরা।

—এ কি ? এ কে ?

অর্জুনবাবু এখন দর্শক মাত্র। কুঙ্কুম, কুঙ্কুম আসতে চেয়েছিল। কুঙ্কুমের পাশে আমি শুয়েছিলাম, কুঙ্কুম…

কাপ্তান সাটিনের ঢাকনা উলটে ফেলে। পেট ফোলা, পচধরা যমুনা শুয়ে আছে। শরীরের সর্বত্র রস কাটছে। মুখ ফুলে দাঁত বেরিয়ে আছে। গন্ধ, গন্ধ, কি অমোঘ গন্ধ।

অর্জুনবাবু বিকট চেঁচিয়ে ওঠেন, না, ও যমুনা নয়! যমুনা হতে পারে না। পরশুরাতেই আমি যমুনাকে সরিয়ে দিয়েছিলাম। দেশাই! দেশাই জানে।

ম্যানেজার বলেন, দেশাই কাল শেষরাতে বোম্বে থেকে ফিরেছেন। যাক, কথা বলবেন না। ছি ছি ছি! বর্ণমালার নাম ডুবে গেল। থানায় ফোন করছি আমি।

—যমুনা নয়, যমুনা নয়!

—কাপ্তান, ওঁর ওপর চোখ রাখো। ছি ছি! অর্জুনবাবু!

—ও তো আমার ঘরেই কাজ করত না। আরো আরো ঘরে…

—আপনি ওর পাশে শুয়েছিলেন, এখন কি বকছেন যা তা?

কাপ্তান ওঁকে চেপে ধরে। বলে, লাফালাফি করবেন না বাবু! ছি ছি! মুর্দা পাশে নিয়ে ঘুমাচ্ছিলেন?

—কুঙ্কুম শুয়েছিল!

—যমুনা হয়ে গেল? কা তাজ্জব বাত! কেউ কখনো শোনে নি।

মানুষ ভিড় করে ভেঙে পড়ে। "বর্ণমালায়" এমন বিপর্যয় কোনোদিন হয় নি। পাপ চিরকাল চাপা থেকেছে এখানে। এমন করে আত্মপ্রকাশ করে নি।

অর্জুনবাবু অঝোরে কাঁদেন। ওঁর জীবন, জগৎ, সংসার, সুনাম, ঠিকাদারি, গোপন টাকা, বিবাহিত জীবন, সব কিছু ডুবে যাচ্ছে পচা গন্ধে। যমুনা মহোল্লাসে দাঁত বের করে সব জানছে, রস কাটছে, গন্ধ ছড়াচ্ছে। অর্জুনবাবু অজ্ঞান হয়ে যান।
